পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল ২০১৭

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

ভারী স্কুলব্যাগ

আপনার সন্তানকে কুঁজো করে দিচ্ছে না তো?

ঈশানের বয়স মাত্র ছয়। এই সবে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েছে সে। নতুন বই-খাতা ব্যাগে ভরে গলায় ওয়াটার বটল ঝুলিয়ে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যেতে খুব আনন্দ পায় সে। বাড়ির গলির মুখেই স্কুলবাস আসে। মা-বাবা ঈশানের ব্যাগ ওকে নিতে দেন না। নিজেরাই বয়ে নিয়ে স্কুলবাসে তাকে তুলে দিয়ে আসেন। আসার সময়ও একই অবস্থা। গলির মুখে মা দাঁড়িয়ে থাকেন, ছেলের স্কুলব্যাগ বহন করার জন্য। কারণ, এত ভারী ব্যাগ তুলবে কী করে এই রত্তি ছেলে! শুধু ঈশান নয়, আমাদের দেশে এমন কোটি কোটি শিশুর একই অবস্থা। পড়ার বইয়ের ভারে প্রায় কুঁজো হয়ে বাড়ি ফেরে পড়ুয়ারা।

আমার মনে পড়ে আমার নিজের ছোটবেলার কথা। আমরাও পড়ালেখা করেছি। রোজ স্কুল যেতাম। কিন্তু এমন এক মন ওজনের ব্যাগ আমাদের কখনোই বহন করতে হয়নি। স্কুলে পড়ার জন্য যা যা বই-খাতা প্রয়োজন শুধু সেগুলো নিয়েই যেতাম। কিন্তু এখন ছবিটা একেবারে ভিন্ন। ক্লাস ওয়ান থেকেই শিশুদের কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় প্রায় দশ কেজি ওজনের এক স্কুলব্যাগ। একই সাবজেক্টের দু-তিনখানা বই, চারটে কপি এছাড়া একস্ট্রা খাতা ইত্যাদি রোজ স্কুলে নিতেই হবে। প্রশ্ন ওঠে, এত ভারী ব্যাগ যে শিশুরা রোজ বহন করছে তা কি তাদের কোনও ক্ষতি করছে না? এত এত বই-খাতা রোজ স্কুলে নিয়ে যাওয়া কি নিতান্তই বাঞ্ছনীয়?

বিভিন্ন স্কুলে এখন নানা ধরনের বই বহন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আর এসব বইয়ের ভারে শিশুর স্কুলব্যাগ যে প্রচণ্ড ভারী হয়ে যায়, সে বিষয়ে অভিভাবক বা স্কুল কর্তৃপক্ষেরও কোনও মাথাব্যথা থাকে না। যদিও বিষয়টি শিশুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে জানিয়েছেন একাংশ বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক। এক প্রতিবেদনে এই বিষয়টি তুলে ধরেছিল 'হিন্দুস্তান টাইমস'। সেখানে বলা হয়েছে, স্কুলের নির্দেশে শিশুরা যে এমন ভারী ব্যাগ বহন করছে, এবং মা-বাবারাও তাদের সন্তানের কাঁধে এই ব্যাগ তুলে দিচ্ছেন, এতে শারীরিক ঝুঁকিতে পড়ছে শিশুরা। এবং এই ঝুঁকি শুধু শিশু বয়সেই নয়, তাকে মেরুদণ্ড, ঘাড়ব্যথা ও পিঠব্যথা-সহ বিভিন্ন অসুখের ঝুঁকিতে ফেলছে সারা জীবনের জন্য। সম্প্রতি এক গবেষণায় গবেষকরা শিশুদের ভারী স্কুলব্যাগ বহনের ক্ষতিকর দিকগুলো জানতে পেরেছেন।

গবেষকরা বলেন, ভারী স্কুলব্যাগ শিশুর পিঠ ব্যথা ও শিশুর কুঁজো হয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী। কোনও কোনও গবেষণায় দেখা গেছে, বয়ঃসন্ধিকালে যেসব শিশু পিঠে ব্যথাজনিত সমস্যায় পড়ে, তারা বেশি বয়সে ঘাড়, কাঁধ ও মেরুদণ্ড বাঁকা হওয়ার মতো ব্যথার জটিলতায় ভোগে। ভারতীয় গবেষকদের এক গবেষণায় দেখা যায়, ৭ থেকে ১৩ বয়সি ৬৮ শতাংশ শিশুই পিঠব্যথা ও কুঁজো হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এই গবেষণাটি করেছে অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অব ইন্ডিয়া।

শিশুদের পিঠব্যথার সঙ্গে স্কুলব্যাগের ওজনের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আর্কাইভ অব চিলড্রেন-এর একটা গবেষণাপত্রে দেখা গেছে, ভারী স্কুলব্যাগ বহনকারী শিশুদের মধ্যে যারা অতিরিক্ত ওজনের ব্যাগ বহন করছে তারাই বেশি সমস্যায় পড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্কুলব্যাগ হোক

এরপর ছয়ের পাতায়

দুইয়ের পাতায়
বিশেষ প্রবন্ধ
বারমুডা ট্রায়ংগল আবিষ্কার
তিনের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
বিজ্ঞান
ক্লাস এইট-এর টিউশন
ভূগোল
চারের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
জীবন বিজ্ঞান
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ইতিহাস
পাঁচের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
বাংলা ব্যাকরণ
কম্পিউটার
ছয়ের পাতায়
ক্যুইজ ও টিপস
সাতের পাতায়
বিতর্ক যখন শিক্ষা নিয়ে
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
প্রজাপতি

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

মানবিক বোধের বিকাশ চাই

সুজাতা ঘোষ শিক্ষিকা, হোলি ফ্যামিলি গার্লস হাইস্কুল, কৃষ্ণনগর

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক তৈরি করা দরকার। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু বেশি টাকাপয়সা উপার্জন নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, নতুন কিছু জানার ইচ্ছে যেন কখনও না শেষ হয়। তাই পড়াশোনা শুধু পাঠ্যবইতে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। যা পড়ছ বা শিখছ তাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে হবে। জ্ঞানের প্রয়োগ দৈনন্দিন জীবনে করতে পারলে তবেই বোঝা যাবে যে, শিক্ষার আত্মীকরণ হয়েছে। পড়াশোনার সঙ্গে মানবিক বোধের বিকাশ ঠিকঠাক হওয়া দরকার।

পড়াশোনার জন্যে দরকার ভালো করে খুঁটিয়ে পড়া, যে কোনও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা। তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। যত বেশি বই পড়বে তত বেশি জানা যাবে। পড়ার কোনও বিকল্প নেই। এর সঙ্গে নিয়মিত স্কুল করা, রোজকার পড়া রোজ করা দরকার। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেভাবে বলবে সেভাবে চললে ভালো ফল নিশ্চয় হবে। আমি অনেককে বলতে শুনি যে, তাদের ভূগোল পড়তে ভালো লাগে কিন্তু তাদের একটা জায়গার নাম জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতে পারে না। কারণ গ্লোব দেখা, ম্যাপ দেখা এই সব কাজ তারা করে না। অনুসন্ধিৎসার অভাবে এমনটা হয়। সঠিকভাবে শিক্ষাগ্রহণ করলে জীবনে যে কোনও রকম পরিস্থিতি তৈরি হোক না কেন মোকাবিলা করা যাবে। আশা করি, সবাই মানুষের মতো মানুষ হবে।

'উত্তরণ'-এর মুখোমুখি | রোল নং ওয়ান

শিক্ষিকাদের নির্দেশমতো পড়াশোনা করি

রিয়া বৈদ্য অষ্টম শ্রেণি, ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়, ডিব্রুগড়

পঞ্চম শ্রেণি থেকে প্রথম স্থান দখল করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছিল। কিন্তু ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে উঠতে তৃতীয় হয়। এতেই সাংঘাতিক আত্মসম্মানে লেগেছিল ডিব্রুগড়ের ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী রিয়া বৈদ্যর। ফলে নিজের জেদকে সম্বল করে এবার ক্লাস সেভেন থেকে ফার্স্ট পজিশন নিয়ে এইটে উঠেছে রিয়া। বাবা সামান্য কাঠমিস্ত্রি। আর্থিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। মেয়েকে পড়াতে হবেই, তাই কষ্ট করে হলেও প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেননা, পুথিগত বিদ্যা নেই রিয়ার বাবা-মায়ের। তবে রিয়া যে ভালো ফল করবে সেই বিশ্বাস আছে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। 'উত্তরণ'-এ নিজের পড়াশোনার নিয়ে খোলামেলা কথা বলল রিয়া।

উত্তরণ: পড়াশোনার ক্ষেত্রে তোমার কোন বিষয় সবচাইতে ভালো লাগে?

রিয়া: ইংরেজি ও অঙ্ক।

উত্তরণ: কত সময় তুমি পড়াশোনা করো?

রিয়া: সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঘুম ভাঙার পর বই নিয়ে পড়তে বসি। এরপর স্কুলে চলে যাই। আবার স্কুল থেকে ফিরে টিউশনে যাই। ফিরে এসে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় আবার পড়তে বসি। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা পর্যন্ত পড়ি।

উত্তরণ: টিভি দেখো?

রিয়া: হ্যাঁ, তবে রাতে পড়াশোনা শেষ করার পর। বেশি টিভি দেখতে আমার ভালোও লাগে না। তবে, বই পড়তে বেশি ভালো লাগে।

উত্তরণ: মাধ্যমিক দিতে আর মাত্র দু'বছর। কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছ?

রিয়া: স্কুলের শিক্ষিকারা আমাকে যেভাবে পড়তে বলেন, আমি সেভাবেই পড়ছি। ভালো রেজাল্ট আমাকে করতেই হবে। আমার মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের স্বপ্ন আমি পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

উত্তরণ: ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে তৃতীয় স্থান নিয়ে। কেন? কোনও অসুবিধা ছিল?

রিয়া: আমি শান্তিপাড়া বঙ্গীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম। এরপর ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। নতুন পরিবেশে আমার একটু অসুবিধা হচ্ছিল। তবে এখন আমি সেটা মানিয়ে নিয়েছি। কোনও অসুবিধা নেই এখন। ভবিষ্যতে আরও ভালো রেজাল্ট করতে চাই। তাই সেভাবেই পড়ছি।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ, তনুশ্রী দাস, বিপাশা চক্রবর্তী, দোয়েল দত্ত, শিবানী দাস, এনায়তি দেবদত্ত** (শিলচর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, সুদীপ্ত চৌধুরী, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সৌম্য নিয়োগী, রাহুল চক্রবর্তী, অতনু পাল** (ফোটোগ্রাফার)

বারমুডা ট্রায়াংগল

পৃথিবীর রহস্যময় স্থানগুলোর তালিকা করা হলে সে তালিকার প্রথমদিকে থাকবে এই নামটি। রহস্যময়, ভুতুড়ে, গোলমেলে, অপয়া সব বিশেষণই বারমুডা ট্রায়াংগলের জন্য উপযুক্ত। সারা বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে আলোচিত রহস্যময় অঞ্চল হচ্ছে এই বারমুডা ট্রায়াংগল। এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অসংখ্য গবেষণা চালানো হয়েছে, এই স্থানকে নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল তৈরি করেছে ডকুমেন্টারি। তবু আজও এই স্থানটির রহস্যময়তার নেপথ্যে কী রয়েছে তা জানা সম্ভব হয়নি।

বারমুডা ট্রায়াংগল এলাকাটি আটলান্টিক মহাসাগরের একটি বিশেষ ত্রিভুজাকার অঞ্চল যেখানে বেশ কিছু জাহাজ ও উড়োজাহাজ রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। কিন্তু সত্যিকার অর্থে বারমুডা ট্রায়াংগলের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দিষ্ট নয়। কেউ মনে করেন, এর আকার ট্রাপিজয়েডের মতো যা ছড়িয়ে আছে স্টেটস অব ফ্লোরিডা, বাহামা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ইশোর পূর্বদিকের আটলান্টিক অঞ্চল জুড়ে। আবার কেউ কেউ এগুলোর সঙ্গে মেক্সিকোর উপসাগরকেও যুক্ত করেন। তবে লিখিত বর্ণনায় যে সকল অঞ্চলের ছবি ফুটে ওঠে তাতে বোঝা যায় ফ্লোরিডার আটলান্টিক উপকূল, সান হোয়ান, পর্তুরিকো, মধ্য আটলান্টিকে বারমুডার দ্বীপপুঞ্জ এবং বাহামা ও ফ্লোরিডা স্টেটসের দক্ষিণ সীমানা জুড়ে এটি বিস্তৃত।

বারমুডা ট্রায়াংগলের বিষয়ে বিভিন্ন লেখক রেফারেন্স হিসাবে সর্বপ্রথম ক্রিস্টোফার কলম্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন। কলম্বাস লিখেছিলেন যে, তাঁর জাহাজের নাবিকেরা এই অঞ্চলের দিগন্তে আলোর নাচানাচি এবং আকাশে ধোঁয়া দেখেছেন। এছাড়া তিনি এখানে কম্পাসের উলটোপালটা দিক নির্দেশনার কথাও বর্ণনা করেছেন। এরপরেও অসংখ্য ঘটনা বিশ্ববাসীর সামনে এসেছে বারমুডা ট্রায়াংগলকে কেন্দ্র করে।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫টি যুদ্ধবিমান প্রশিক্ষণের জন্য আকাশে ওড়ে। কিছুক্ষণ পরেই তারা সেই ভয়ংকর বারমুডা ট্রায়াংগলের কাছে চলে যায় এবং কেন্দ্রে মেসেজ দেয় যে, তারা সামনে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধুই কুয়াশা। পরবর্তীতে তাদের উদ্ধার করার জন্য একটি উদ্ধারকারী দল সেদিকে পাঠানো হয় কিন্তু তাদেরও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর পরপরই বারমুডা ট্রায়াংগল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

১৯৫৯ সালের ১৭ জানুয়ারি স্টার এরিয়েল নামের একটি বিমান লন্ডন থেকে জামাইকা যাচ্ছিল। সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে এটি বারমুডার আকাশে উড়ল। তখন আবহাওয়া ছিল স্বাভাবিক ও সুন্দর। আর সমুদ্র ছিল শান্ত। ওড়ার ৫৫ মিনিট পর বিমানটি অদৃশ্য হয়ে গেল। এ নিয়ে অনেক অনুসন্ধান হল। কিন্তু সমুদ্রের কোথাও বিমানটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেল না। বিমানটি অদৃশ্য হয়েছিল ১৭ জানুয়ারি রাতে। ১৮ তারিখ রাতে এক অনুসন্ধানী দল জানাল, সেখানকার সমুদ্রের বিশেষ বিশেষ একটি জায়গা থেকে অদ্ভুত একটি আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। এই ঘটনার এক বছর আগে সেখান থেকে রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল একটি ডিসি-৩ বিমান। সেটি যাচ্ছিল সানজুয়ান থেকে সিয়ামি। এছাড়াও অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ আছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলকে নিয়ে।

এই জায়গাটি নিয়ে আরেকটি গুজব আছে, অনেকেই মনে করে, ভিনগ্রহের মানুষেরা যখন পৃথিবীত আসে তখন তারা এই জায়গাকে তাদের ঘাঁটি বানিয়ে নেয় এই কারণে এখানে যা কিছু আসবে সেটি গায়েব করে দেবে যাতে তাদের কেউ ক্ষতি করতে না পারে বা চিহ্ন খুঁজে না পায়।

এই অঞ্চলের রহস্যময়তার একটি দিক হল, কোনও জাহাজ এই ত্রিভুজ এলাকায় প্রবেশ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তা বেতার তরঙ্গ প্রেরণে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং এর ফলে জাহাজটি উপকূলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয়। একসময় তা দিক নির্ণয় করতে না পেরে রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তথ্যানুসারে, গত ২০০ বছরে এ এলাকায় কমপক্ষে ৫০টি বাণিজ্যিক জাহাজ এবং ২০টি বিমান চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এর মধ্যে ১৯৬৮ সালের মে মাসে হারিয়ে যাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ডুবোজাহাজের ঘটনাটি সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তোলে। ঘটনার তদন্তে এর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত যে ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে তা হল, এলাকাটির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে স্বাভাবিকের চাইতে কুয়াশা অনেক বেশি এবং এর ঘনত্বও তুলনামূলকভাবে বেশি। ফলে নাবিকেরা প্রবেশের পরই দিক হারিয়ে ফেলে এবং তাদের মধ্যে একপ্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। হয়তো এ বিভ্রান্তির ফলেই তারা যথাযথভাবে বেতার তরঙ্গ পাঠাতে পারে না। প্রমাণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, আধুনিক কালের সমস্ত জাহাজ জিএসএম প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে, তাদের একটিও এই সমস্যায় পড়েনি। আর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে না পাবার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা বলেন, বারমুডা ট্রায়াংগলে সমুদ্রের গভীরতা এতটাই বেশি যে এখানে যদি কোনও বিমান বা জাহাজ হারিয়ে যায় বা বিধ্বস্ত হয় তবে তার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া খুবই অসাধ্য একটি ব্যাপার।

বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তিতে স্যাটেলাইট ব্যবহার করে যদি এর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় তারপরেও সেটি উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার।

হঠাৎ হয়ে যাওয়া আবিষ্কার

কোনও কিছু করব বলে ভেবেও সবসময় যে মনের মতো জিনিসটিই আমরা তৈরি করতে পারি তা কিন্তু নয়। অনেক সময় যা ভেবেছি তার উলটো জিনিসও তৈরি হতে পারে।

প্রয়োজন সবসময় উদ্ভাবনের ক্ষেত্র তৈরি করে না। দুর্ঘটনাক্রমেও অনেক বিশাল আবিষ্কার হয়েছে। আমাদের রোগের চিকিৎসা, তৃপ্তির খাবার এবং প্রতিদিনকে আনন্দময় করতে বিজ্ঞান যেসব জিনিস দিয়েছে তার সবকিছুই কিন্তু খুব ভেবেচিন্তে বের করা হয়নি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে যা হঠাৎ করেই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। আজ আমরা সেই হঠাৎ আবিষ্কারের কিছু কথা জানব।

পেনিসিলিন: স্যার আলেক্সান্ডার ফ্লেমিং এই বিস্ময়কর ওষুধ হঠাৎ করেই তৈরি করেন। এ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে তিনি তা ছুড়ে ফেলে দেন এবং তখনই যা চাচ্ছিলেন তা পেয়ে যান। ১৯২৮ সালের একদিন ফ্লেমিং দেখেন যে, তার পেট্রি ডিসে যে পদার্থ তৈরি হয়েছে তা সব ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলছে। সেখান থেকেই তৈরি হয় বিস্ময়কর অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন। ১৯০০ সাল থেকে সংক্রমণের কারণে মানুষ যেভাবে মারা যেত, পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর মৃত্যুর হার বিশ ভাগের এক ভাগ কমে গেছে।

কোকাকোলা: ফার্মাসিস্ট জন পেমবার্টন এই জনপ্রিয় পানীয়টি আবিষ্কার করেন। ১৮৮০-এর দশকে আটলান্টায় বসবাসের সময় পেমবার্টন মদ ও কোকো দিয়ে তৈরি একধরনের সিরাপ বিক্রি করতেন যার নাম ছিল 'পেমবার্টনস ফ্রেঞ্চ ওয়াইন কোকা'। দুর্বলতা এবং মাথাব্যথা নিরাময়ের কাজে এ সিরাপ ব্যবহার করা হত। ১৮৮৫ সালে আটলান্টায় মদ বিক্রি নিষিদ্ধ হলে পেমবার্টন খাঁটি কোকা দিয়ে কার্বনেটেড পানীয় হিসাবে সিরাপটি বানান যা আজকের কোকাকোলা।

চকোলেট চিপ কুকি: টল হাউস ইন-এর মালিক রুথ ওয়েকফিল্ড চকোলেট কুকি বানাতে গিয়ে আজকের জনপ্রিয় চকোলেট চিপ কুকি বানিয়ে ফেলেন। ১৯৩০-এর দিকে বেকারস চকোলেটে কাজ করার সময় এই নারী কুকির কাঁচা অংশে চকোলেট ছোট ছোট করে কেটে দিয়ে দেন।

আলুর চিপস: নিউ ইয়র্কের ক্যারি মুন লেক হাউসের শেফ জর্জ ক্রাম ১৮৫৩ সালের একদিন এক ক্রেতার জন্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বানাচ্ছিলেন। দেওয়ার পর ওয়েটার তা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং শেফকে বলেন তা আরও পাতলা এবং মচমচে করে দিতে। শেফ রেগে গিয়ে একেবারে পাতলা করে আলু কাটেন এবং তা খটখটে না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকেন। তৈরি হয় আজকের পটেটো চিপস।

পেসমেকার: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জন হুপস হাইপোথারমিয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে দেহের তাপমাত্রা ফেরাতে কাজ শুরু করেন। তিনি বুঝতে পারেন, যদি ঠান্ডায় হৃদ্‌যন্ত্র কাজ বন্ধ করে দেয় তবে একে কৃত্রিমভাবে চালু করা যাবে। এই উপলব্ধি থেকেই ১৯৫১ সালে তৈরি হয় পেসমেকার।

সিলি পুটি: জেনারেল ইলেকট্রিকে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার জেমস রাইট এটি আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্লেনের টায়ার, গ্লাভস ইত্যাদির জন্য রাবারের প্রয়োজন হয়। এর বিকল্প হিসাবে জেমস সিলিকন থেকে কিছু একটা বানানোর চেষ্টায় ছিলেন। ১৯৪৩-এর দিকে হঠাৎ একদিন তিনি সিলিকন ওয়েলে বরিক অ্যাসিড দিলেন। এতে আঠালো এবং বাউন্স করে এমন একধরনের পদার্থ তৈরি হয়। এর বাস্তবিক ব্যবহার তিনি তক্ষুনি বুঝতে না পারলেও খুব শিগ্‌গিরই সিলি পুটি দারুণ কাজের বস্তুতে পরিণত হয়।

মাইক্রোওয়েভ ওভেন: ১৯৪৬ সালের দিকে রেথিওন কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার পারসি স্পেন্সার বায়ুশুন্য টিউবের মধ্যে রাডার সংক্রান্ত একটি পরীক্ষা করছিলেন। এটি করার সময় তার পকেটে থাকা একটি ক্যান্ডি গলতে শুরু করে এবং তিনি তা খেয়াল করেন। তিনি দ্রুত কিছু কর্ন সেখানে দিলেন। মুহূর্তেই হয়ে গেল পপকর্ন। তৈরি হল আজকের অতি প্রয়োজনীয় মাইক্রোওয়েভ ওভেন।

ওষুধ হিসাবে এলএসডি: ১৯৩৮ সালে সুইজারল্যান্ডের একটি ল্যাবরেটরিতে রসায়নবিদ অ্যালবার্ট হফম্যান লিজারসিক এসিড নিয়ে কাজ করছিলেন। এর যাবতীয় বিষয় নিয়ে গবেষণাকালে তিনি অসচেতনভাবে সামান্য অংশ গিলে ফেলেন। এর মাধ্যমে বের হয়ে আসে মানুষকে অকল্পনীয় কাল্পনিক জগতে নেওয়ার একটি ওষুধ এলএসডি। খোদ স্টিভ জবস বলেছেন, জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ যে দু-তিনটি কাজ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হল, এলএসডি নেওয়া।

স্যাকারিন: জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কনস্টেনটাইন ফালবার্গ ১৮৭৯ সালে কয়লার নতুন ব্যবহার নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। কোনও এক পর্যায়ের পরীক্ষার পর কয়লার গাদ লেগেছিল তাঁর হাতে। গবেষণার ফাঁকে বিস্কুট খেতে গিয়ে খেয়াল করলেন, তা আগের চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি লাগছে। পেয়ে গেলেন স্যাকারিন।

পোস্ট-ইট নোট: ১৯৬৮ সালের কথা। থ্রিএম ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন স্পেন্সার এবং আর্ট ফ্রাই। স্পেন্সার তার বানানো হালকা আঠার কোনও ব্যবহার খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই আঠার বৈশিষ্ট্য ছিল তা হালকা কিছুকে বোর্ডে বা দেয়ালে লাগিয়ে রাখতে পারত। আবার তুলে ফেললে দুটো স্তরের কোনোটাই ক্ষতিগ্রস্ত হত না। একদিন তার বন্ধু বইয়ে ছোট ছোট নোট লেখা কাগজ লাগানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সমাধান না পেয়ে মেজাজ খারাপ হয় তার। এ বিষয় নিয়ে দুই বন্ধুর কথোপকথনের সময় বার হয়ে আসে পোস্ট-ইট নোটসের ধারণা।

স্কচগার্ড: থ্রিএম-এর কেমিস্ট প্যাস্টি শেরম্যান ১৯৫৩ সালে এয়ারক্র্যাফটের জ্বালানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এমন একটি রাবার বানানোর কাজ করছিলেন। একটি তরলের মিশ্রণ নিয়ে কাজ করার সময় হঠাৎ সেখান থেকে একটি ফোঁটা তার জুতোয় পড়ে। শেরম্যান খেয়াল করেন, তার জুতো ময়লা থাকলেও ফোঁটা যেখানে পড়েছিল সে স্থানটি চকচক করছে। এটি নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন যা আজকের স্কচগার্ড।

কর্ন ফ্লেক্স: জন এবং উইল কেলগ শস্যকণা থেকে গ্র্যানোলা বানানোর চেষ্টা করছিলেন। ১৮৯৮ সালের ঘটনা, তারা বিভিন্ন শস্যকণা জ্বাল দিতে গিয়ে তা ভুলে কয়েকদিন একটি স্টোভে রেখে দেন। এতে শস্য জ্বাল হয় এবং শুকনো ও পাতলা হয়ে যায়। এতে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক কারিগরি ফলানোর পর ভেজা ভাব চলে যায় এবং আজকের কর্ন ফ্লেক্স তৈরি হয়।

স্লিংকি: ১৯৪৩ সালে রিচার্ড জোনস এমন একটি মিটার ডিজাইন করতে চেয়েছিলেন যা যুদ্ধের জাহাজের শক্তি পর্যবেক্ষণ করবে। টানটান একটি স্প্রিং নিয়ে কাজ করার সময় হঠাৎ একটি স্প্রিং নীচে পড়ে এক জায়গায় অবস্থান করে এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। ব্যস, জন্ম হল আজকের স্লিংকির।

অ্যানেসথেসিয়া: হোরাস ওয়েল ১৮৪৪সালে এই পদ্ধতির উদ্ভাবনকারী। পরীক্ষাগারে রোগীর অস্ত্রোপচারের সময় রোগীকে অচেতন করে ফেলা হয়। আবার অনেক সময় শরীরের কোনও বিশেষ অংশকে সাময়িকভাবে অনুভূতিহীন করে ফেলা হয়। এটাকে বলে অ্যানেসথেসিয়া। এর জন্য ব্যবহার করা হয় নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাস। সে আমলে নাইট্রাস অক্সাইড ছিল

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল ২০১৭

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন | বিজ্ঞান

আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ

আজ আমরা আলোচনা করব আলোর প্রতিফলন ও আলোর প্রতিসরণ নিয়ে।

অনেক সময় দেখবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা উজ্জ্বল রোদের মধ্যে আয়না ধরে একটু এদিক-ওদিক করলে দেওয়ালের ওপর একটা আলো নড়ে ওঠে। সেটা কি জানো? একেই বলে আলোর প্রতিফলন। চলো একটু বিস্তারিত ভাবে জেনে নেওয়া যাক।

আয়নাতে পড়ে আলোর আবার ফিরে আসার ঘটনাকেই বলে আলোর প্রতিফলন।

যেমন ধরো, একটা সাদা শক্ত কাগজে একটা xy সরলরেখাংশ নেওয়া হল। এখন ওই রেখাংশে একটা চাঁদা বসিয়ে 0^o থেকে 180^o পর্যন্ত চিহ্নিত করা হল এবং 60^o কোণটি আঁকা হল। এবার কাগজটা টেবিলের ওপর পেতে দেওয়া হল। একটা চিরুনি নেওয়া হল এবং চিরুনির দাঁতগুলো কালো মোটা কাগজ দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হল যেন মাঝখানের একটামাত্র ফাঁক ঢাকা না পড়ে। কাগজের উপর আঁকা সরলরেখা বরাবর একটা ছোট আয়না দাঁড় করানো হল। এমন একটি আয়না নিতে হবে যার চারদিকে কোনও ফ্রেম নেই। এবার চিরুনিটি কাগজের ওপর এমনভাবে দাঁড় করানো হল যাতে দাঁতগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটি কোনও একটি কোণের দাগের ওপরে থাকে। এবারে ঘর অন্ধকার করে সরু মুখওয়ালা টর্চটি এমনভাবে জ্বালানো হল যাতে টর্চের আলো চিরুনির ওই ফাঁকা জায়গায় পড়ে। দেখা যাবে যে, 60^o করে আয়নায় পড়া আলো আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে উলটোদিকের 60^o চিহ্নিত দাগের ওপর দিয়েই যাচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১) যে পথ ধরে আলো আয়নায় এসে পড়েছে তাকে বলা হয় আপতিত আলোকরশ্মি।

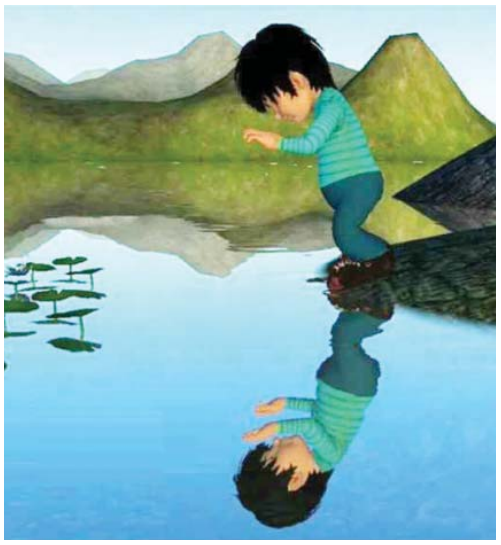

২) আয়নায় পড়ে আলো যে পথ ধরে ফিরে যায় তাকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি বলে।

৩) আয়নার উপর যে বিন্দুতে আপতিত আলো এসে পড়েছে তাকে আপতন বিন্দু বলে।

৪) আয়নার অবস্থান যে সরলাংশ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে তাকে প্রতিফলক রেখা বলা হয়।

৫) প্রতিফলকের উপর আপতন বিন্দুতে আঁকা লম্বকে অভিলম্ব বলে।

৬) অভিলম্ব ও আপতিত রশ্মির মাঝের কোণকে আপতন কোণ বলে।

৭) অভিলম্ব ও প্রতিফলিত রশ্মির মাঝের কোণকে প্রতিফলন কোণ বলে।

তাহলে বলা যায় আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিফলকের উপর আপতন বিন্দুতে আঁকা অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। এটিও প্রতিফলনের একটি নিয়ম।

নিয়মিত প্রতিফলন:

কোনও মসৃণ তলে প্রতিফলন সাধারণ ভাবে নিয়মিত প্রতিফলন। যেমন— আয়নার প্রতিফলন, চকচকে স্টিলের মসৃণ বাটিতে প্রতিফলন।

নিয়মিত প্রতিফলনের সময় আপতিত আলোর রশ্মিগুচ্ছ একটি বিশেষ ধরনের হলে প্রতিফলনের পরে সেই রশ্মিগুচ্ছ বিশেষ ধরনেরই হয়। যেমন— সমান্তরাল বা অপসারি।

বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন:

প্রতিফলন যখন অমসৃণ তলে ঘটে তখন সেই প্রতিফলনকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বলে। যেমন— গাছপালা, মাটি, ঘরের দেওয়াল, সিনেমার পর্দা প্রভৃতি।

এবার আলোচনা করব আলোর প্রতিসরণ নিয়ে।

আলোকরশ্মি কোনও মাধ্যম দিয়ে যেতে যেতে যদি অন্য কোনও আলাদা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন ওই মাধ্যম দু'টির বিভেদতল থেকে আলোর গতিপথের পরিবর্তন ঘটে। একেই বলা হয় আলোর প্রতিসরণ। তোমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে, বিভেদতল কী জিনিস?

একটা সহজ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বুঝে নাও।

একটা কাচের গ্লাসে কিছুটা জল নিতে হবে। ওপর থেকে জলের যে তল দেখতে পাওয়া যাবে তা বায়ু ও জলকে আলাদা করেছে। জলের এই তল হল বায়ু ও জলের বিভেদ তল।

ক্লাস এইট-এর টিউশন | ভূগোল

শিলা

আজ আমরা আলোচনা করব শিলা সম্পর্কে। শিলা কী?

শিলা হচ্ছে আসলে এক বা একাধিক খনিজের সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব মিশ্রণ। যে খনিজ দিয়ে শিলা তৈরি হয় তা হল এক বা একাধিক অজৈব মৌলিক পদার্থের যৌগ। বিভিন্ন রকমের শিলা দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি শিলা একে-অপরের থেকে আলাদা। রং, কাঠিন্য, উজ্জ্বলতা, মসৃণতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে এদের তিনটি ভাগ করা হয়। আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা, রূপান্তরিত শিলা।

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক, পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য। প্রথম তিনটি পাললিক শিলা হল চুনাপাথর, বেলেপাথর, কাদাপাথর।

চুনাপাথর-এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? এটি একটি চুনময় পাললিক শিলা। আমরা জানি সাধারণত চুনাপাথর বা ক্যালশিয়াম কার্বনেট জলে দ্রবীভূত হয় না। তবে বৃষ্টির জল বা অ্যাসিড মেশানো জল তাড়াতাড়ি একে গলিয়ে ফেলে। এর ফলে ক্যালশিয়াম কার্বনেট ক্যালশিয়াম বাই কার্বনেটে পরিণত হয়। এদের ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, অন্যদিকে অভিগম্যতা বেশি। চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চলে বৃষ্টির জল দ্রুত গর্ত সৃষ্টি করে নীচে নেমে যায়। চুনাপাথর নানা রঙের হতে পারে। সাদা, ধূসর, সবুজ, কালচে ইত্যাদি। সিমেন্ট তৈরিতে, লৌহ ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এবার আমরা আসি কাদাপাথরে। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে কর্দমময় পাললিক শিলা। একে খুব সহজেই চেনা যায়। এর রং কালচে ধূসর। এটি মিহি দানা যুক্ত শিলার উদাহরণ হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়। এর সছিদ্রতা খুব বেশি। সাধারণত কাদা পাথর খুব নরম ও খুব সহজেই ভেঙে যায়। এই শিলা পাতলা স্তরে ভাঙা যায় বলে বাড়ির টালি তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। খুব সহজেই স্তর বরাবর ভেঙে যায় বলে এই শিলার সংলগ্ন অঞ্চলে বড় ধরনের নির্মাণ কাজ করা উচিত নয়।

আরও একটি পাললিক শিলা হল বেলেপাথর। বালিময় পাললিক শিলা। এর অভিগম্যতা ও সছিদ্রতা বেশি হলেও এর ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বেশি। এই কারণেই স্থাপত্যশিল্প, স্মৃতিসৌধ নির্মাণে এই পাথর ব্যবহৃত হয়। হলুদ, কমলা, লাল, গোলাপি, সাদা ধূসর হতে পারে বেলেপাথর। প্রাচীন ভারতের অনেক স্থাপত্য শিল্প যেমন- লালকেল্লা, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, খাজুরাহোর মন্দির, এমনকী সোনার কেল্লাও বেলেপাথরে তৈরি।

এবার আসা যাক রূপান্তরিত শিলায়। কাকে বলে রূপান্তরিত শিলা? আগ্নেয় ও পাললিক শিলা ভূ-অভ্যন্তরের প্রচণ্ড চাপ, তাপ, নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে তার পুরনো ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম বিশিষ্ট শিলায় পরিণত হয়। একেই বলে রূপান্তরিত শিলা। শিলা রূপান্তরিত হতে পারে নানা ভাবে।

১) প্রচণ্ড চাপে। উদাহরণ— শেল থেকে স্লেট।

২) অত্যধিক তাপে। যেমন— পিট কয়লা থেকে গ্রাফাইট।

৩) রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। যেমন— অ্যান্ডালুসাইট থেকে সিলিমেনাইট।

একটি রূপান্তরিত শিলার কথা জানা যাক।

মার্বেল: মার্বেল হল চুনাপাথরের রূপান্তরিত রূপ। মার্বেল পাথর দেখতে বেশ সুন্দর, মসৃণ, ও চকচকে। নানা রঙের হয় এই মার্বেল। কখনও সাদা আবার সবুজ, হলুদ, নানা রঙের। তবে অ্যাসিডে মার্বেল দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায়। তাই অ্যাসিড মিশ্রিত জল মার্বেলের সংস্পর্শে আনা উচিত নয়।

এরপর আসা যাক আগ্নেয় শিলায়। পৃথিবী সৃষ্টির সময় উত্তপ্ত ও তরল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে ভূত্বকের মধ্যে ও ওপরে যে কঠিন শিলার সৃষ্টি হয় সেটি আগ্নেয় শিলা। পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হওয়া এই শিলার আরেক নাম প্রাথমিক বা আদি শিলা। এই শিলার বিশেষত্ব কী? এই শিলা শক্ত, ভারী, ও ঘনত্ব খুব বেশি। উজ্জ্বল কেলাসের মতো এদের গঠন। এই শিলা হালকা বা ভারী দু'ধরনেরই হতে পারে। ভঙ্গুরতা যথেষ্ট কম হওয়ায় এর প্রতিরোধের ক্ষমতা অনেক বেশি। আগ্নেয় শিলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনে নিই।

গ্রানাইট: এই আগ্নেয় শিলার মাধ্যমে মহাদেশীয় ভূত্বক তৈরি। এই শিলা অপ্রবেশ্য। খুব ভারী ও শক্ত হওয়ায় গ্রানাইটের ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি। ভূ-অভ্যন্তরে অতি ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে জমাট বাধায় এই শিলার দানাগুলো কিছুটা বড়। এই শিলায় গঠিত অঞ্চলের ভূমিরূপ সাধারণত গোলাকার হয়।

জানাঅজানা

মানুষের মতো আয়না দেখে নিজেদের চিনতে পারে শিম্পাঞ্জি এবং ডলফিন!

শ্বেত ভালুক কোনওরকম বিশ্রাম না নিয়ে একটানা ৬০ মাইল পর্যন্ত সাঁতার কাটতে পারে!

মাছির গড় আয়ু মাত্র ১৭ দিন।

একটা মানুষের শরীরের সবটুকু রক্ত খেয়ে ফেলতে ১,২০০,০০০টি মশার প্রয়োজন!

ইঁদুর আর ঘোড়া বমি করে না!

একটি মশার ওজন হতে পারে ২.৫ মিলিগ্রাম অর্থাৎ ০.০০২৫ গ্রাম!

কিং কোবরা পৃথিবীর একমাত্র সাপ, যে বাসা বাঁধে।

গোল্ড ফিশ ৩ সেকেন্ডের জন্যে তার স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে পারে।

টাইগার শার্ক-এর বাচ্চারা মায়ের পেটে থাকাকালীন একে অপরের সঙ্গে মারামারি শুরু করে। যেটা বেঁচে থাকে সেটা জন্ম নেয়।

পৃথিবীর সকল মানুষের মোট ওজন, পৃথিবীর সব পিঁপড়ের মোট ওজনের সমান।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পোস্ট অফিস রয়েছে ভারতে।

সুইজারল্যান্ডের মানুষরা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি চকোলেট খায়। গড়ে প্রতিজন চকোলেট খায় বছরে প্রায় ১০ কেজি করে!

আফ্রিকায় অন্য যে কোনও প্রাণীর আক্রমণের চেয়ে জলহস্তীর আক্রমণে বেশি মানুষ মারা যায়!

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল ২০১৭

জানাঅজানা

আইসক্রিম সর্বপ্রথম চিনে তৈরি হয়েছিল, তাও খ্রিস্টের জন্মের ২০০০ বছর আগে।

আমেরিকার নিউইয়র্কে বছরে ১,৬০০ লোক অন্য মানুষের কামড়ে আহত হয়!

কানাডায় যেই পরিমাণ লেক আছে, সমগ্র পৃথিবীতে একত্রেও সেই পরিমাণ লেক নেই।

জাপানের মোট স্থলভাগের ৭০ শতাংশের বেশি পাহাড়। এর মধ্যে আবার ২০০-র বেশি আগ্নেয়গিরি!

নিউইয়র্কে কোনও উঁচু বিল্ডিং থেকে লাফিয়ে পড়ার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড! (অর্থাৎ, কেউ লাফিয়ে পড়ে যদি বেঁচে যায় তবে তাকে সুস্থ করে বাঁচিয়ে তুলে, আবার মেরে ফেলা হবে)

প্রতি বছর ভারতে প্রায় ৩০ কোটি ছবির টিকিট বিক্রি হয়ে থাকে!

২৪ ঘণ্টায় ছেলেরা গড়ে ২০০০ শব্দ এবং মেয়েরা গড়ে ৫০০০ শব্দ ব্যবহার করে থাকে!

ইংরেজি বর্ণমালায় সর্বাধিক ব্যবহার করা বর্ণ হল E এবং সবচেয়ে কম ব্যবহার করা বর্ণ হল Q!

পৃথিবীর মোট জীবিত প্রাণীর ৮৫ ভাগই জলে বাস করে!

প্রতি মিনিটে পুরো বিশ্বে ৬০০০ বা তার অধিকবার বজ্রপাত হয়!

পৃথিবীর সব সাগরে যে পরিমাণ লবণ আছে তা দিয়ে পৃথিবীকে ৫০০ ফুট পুরু লবণের স্তূপ দিয়ে ঢেকে ফেলা যাবে!

ক্লাস নাইন-এর টিউশন | জীবন বিজ্ঞান

জীবদেহের কোষ

আজ আমরা আলোচনা করব জীবন বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় জীবন সংগঠনের স্তর।

পৃথিবীর সমগ্র জীবজগতে এককোষী ও বহুকোষী জীব অবস্থান করে। জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত একক হল কোষ। এই কোষের দু'টি অংশ— কোষ আবরোক ও প্রোটোপ্লাজম। এর অর্থ হল জীবদেহ কতগুলি মৌল দ্বারা গঠিত। যদিও কোনও কোনও রাসায়নিক মৌল কোষের মধ্যে আয়নরূপে বা অজৈব রাসায়নিক যৌগ হিসাবে বা জৈব কোষ হিসাবে কোষের মধ্যে অবস্থান করে। কোষের মধ্যে প্রোটিন, ফ্যাট ও লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, নিউক্লিক অ্যাসিড হল উপাদান। তাই আমরা বলতে পরি জীবদেহে যে সমস্ত অপরিহার্য অজৈব ও জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা অণু পাওয়া যায়, তাদের জৈব অণু বা বায়োমলিকিউল বলে।

জৈব অণু বা বায়োমলিকিউলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১) মাইক্রো মলিকিউল ও ২) ম্যাক্রো মলিকিউল।

১) মাইক্রো মলিকিউল— সরল গঠনযুক্ত, ক্ষুদ্রাকৃতি, নিম্ন আণবিক ভরসম্পন্ন জৈবযৌগকে মাইক্রো মলিকিউল বলে। যেমন—গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড।

২) ম্যাক্রো মলিকিউল— জটিল গঠনযুক্ত, বৃহদাকৃতি, উচ্চ আণবিক ভরসম্পন্ন জৈবযৌগকে ম্যাক্রো মলিকিউল বলে। যেমন—প্রোটিন, ফ্যাট।

জৈব অণু বা বায়োমলিকিউলের কাজ— ১) কোষের গঠন কাঠামো সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ২) কোষের শক্তি উৎপাদন ও শক্তি সঞ্চয়। ৩) জীবের বৃদ্ধি ও অন্যান্য জৈবিক ক্রিয়া জৈব অণু দ্বারা সম্পন্ন হয়।

জৈব অণুর প্রকারভেদ— জীবদেহে তথা সকল প্রকার সজীব কোষে চার প্রকার জৈব অণু পাওয়া যায়। এগুলি হল— প্রোটিন, শর্করা, স্নেহবস্তু ও নিউক্লিক অ্যাসিড।

প্রোটিন— প্রোটিনের গঠনগত একক হল অ্যামিনো অ্যাসিড। মাত্র ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের বিভিন্ন সংযুক্তির ফলে গঠিত হয় বিভিন্ন প্রোটিন। এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরস্পরের সঙ্গে পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড গঠন করে। এক বা একাধিক পলিপেপটাইড মিলিত হয়ে গঠন করে প্রোটিন। এই প্রোটিনের মৌলগুলি হল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার। এছাড়া কিছু প্রোটিনে ফসফরাসও বর্তমান।

প্রোটিনের কাজ— ১) দেহগঠন, ২) দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি, ৩) উৎসেচক সংশ্লেষ।

শর্করা— কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত পলি-হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটোন সমুহকে কার্বোহাইড্রেট বলে। কার্বোহাইড্রেট হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত সর্বদা ২:১ হবে। যে সমস্ত কার্বোহাইড্রেট ও ক্ষুদ্রতম কার্বোহাইড্রেট অণুকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করা যায় না, তাদের সরল শর্করা বলে। যেমন—গ্লুকোজ, গ্যালাকটোজ। যখন দুই বা ততোধিক সরল শর্করা বা মনোস্যাকারাইড পরস্পর গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে, তখন তাকে জটিল কার্বোহাইড্রেট বলে।

জটিল কার্বোহাইড্রেট দু'প্রকার—

১) অলিগোস্যাকারাইড— ২-৯টি মনো-স্যাকারাইড পরস্পর গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হওয়ায় যে জটিল কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয়, তাকে অলিগোস্যাকারাইড বলে। যেমন— মলটোজ, ল্যাকটোজ।

২) পলিস্যাকারাইড—১০ বা ১০-এর অধিক মনো-স্যাকারাইড গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়ে পলিস্যাকারাইড গঠন করে। যেমন— সেলুলোজ, শ্বেতসার।

কার্বোহাইড্রেটের কাজ—১) শক্তি উৎপাদন, ২) শ্বসন বস্তু, ৩) কোষপ্রাচীর গঠনে সাহায্য, ৪) নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষ।

লিপিড বা স্নেহপদার্থ— কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত যে জৈবযৌগ বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের এস্টার এবং জলে অদ্রবণীয় কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় তাকে লিপিড বা স্নেহপদার্থ বলে।

লিপিডের কাজ— ১) শক্তি উৎপাদন, ২) কোষপর্দা গঠন, ৩) অঙ্গ গঠন, ৪) সঞ্চিত খাদ্য ও তাপ সংরক্ষণ।

নিউক্লিক অ্যাসিড— কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজ ও ফসফরাসের সমন্বয়ে গঠিত নিউক্লিওটাইডের শৃঙ্খলাকে নিউক্লিক অ্যাসিড বলে।

নিউক্লিক অ্যাসিডের কাজ— ১) বংশগত পদার্থ পরিচর্চা, ২) জিনগত বৈচিত্র ধারণ, ৩) প্রোটিন সংশ্লেষ।

অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট— কোষের জৈবনিক ক্রিয়ার জন্য শক্তির প্রয়োজন এবং ATP এই শক্তির জোগান দেয়। ATP অণু বিশিষ্ট হয়ে কোষের মধ্যে শক্তির চাহিদা প্রয়োজন অণুযায়ী পূরণ করে, তাই ATP-কে এনার্জি কারেন্সি বলে।

ক্লাস টেন-এর টিউশন | ইতিহাস

সংস্কার: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

মানব সভ্যতার অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি হল মানুষের বুদ্ধি ও শ্রম। মানুষের বুদ্ধি যখন পরিণত হয়নি, তখন অগ্রগতিও থমকে গিয়েছে। আজ শিক্ষা ও সংস্কারের গুণে আমাদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। কিন্তু একসময় আমাদের এই সমাজে নানা ধরনের কুপ্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এই সমাজেই একদিন সতীদাহ, নরবলি বা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের মতো অমানবিক ঘটনা ধুমধাম করে চলত। ঊনবিংশ শতকে বাঙালি হিন্দু সমাজের এই সমস্ত কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। আর বঙ্গ সমাজের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও সাহিত্য। স্বাভাবিকভাবে তৎকালীন সমাজের এক বাস্তব ছবি ধরা দিয়েছে সাহিত্য, সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের পাতায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যে সেই সময়ের যে ছবি আমরা দেখতে পাই, তা নিয়েই এখন আলোচনা করব।

বামাবোধিনী: ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সমস্ত পত্রিকা জনপ্রিয়তার চরমে পৌঁছেছিল তার মধ্যে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' অন্যতম। ১৮৬৩ সালের আগস্টে এই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'-র প্রথম সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। কিছু ব্রাহ্ম নেতা-কর্মীকে নিয়ে ১৮৬৩ সালে 'বামাবোধিনী সভা' গঠন করেছিলেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ছিল সভারই মুখপাত্র। প্রায় ৬০ বছর এই মাসিক পত্রিকাটি চলেছিল।

'বামাবোধিনী পত্রিকা'-তে একধারে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল লেখকদের লেখা প্রকাশিত হত। তৎকালীন সমাজের ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ঘরোয়া ওষুধপত্র, শিশু পরিচর্যা, নারীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নানা ধরনের লেখা বামাবোধিনীতে প্রকাশ পেত। 'বামা' শব্দের অর্থ নারী এবং 'বোধিনী' শব্দের অর্থ বন্দনা বা বোধনকারী। অর্থাৎ নাম থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। বাস্তবেও বাঙালি গৃহবধূদের শিক্ষিত করে তোলা ও সমাজে পরিবর্তন আনতে তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া এই পত্রিকার একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল। নারীদের প্রতি বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এই বামাবোধিনী পত্রিকা।

হিন্দু পেট্রিয়ট: 'হিন্দু পেট্রিয়ট' একটি সাপ্তাহিক খবরের কাগজ। ১৮৫৩ সালের ৬ জানুয়ারি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রথম মালিক ছিলেন মধুসূদন রায়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮৫৫ সালের জুন মাসে হরিশচন্দ্র মুখার্জির বড় দাদা ভবানীপুরের হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকার মালিকানা কিনে নেন। তখন থেকেই এর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নীল বিদ্রোহের (১৮৬০) সময় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হিসাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। দরিদ্র ও অসহায় নীলচাষিদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদে হিন্দু পেট্রিয়ট সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল। ব্রিটিশ স্বৈরাচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদে এই পত্রিকা দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল। হিন্দু পেট্রিয়টে নারী শিক্ষা ও হিন্দু বিধবা বিবাহ নিয়েও বিশেষ আলোচনা করা হয়েছিল। বিধবা বিবাহের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে মানুষের মনে উৎসাহ বৃদ্ধির চেষ্টা হয়েছিল। যদিও হিন্দু সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের বিরোধিতা করেছিল হিন্দু পেট্রিয়ট। ঐতিহাসিকদের একাংশের মতে, সিপাহি বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল হিন্দু পেট্রিয়ট। তাতে লর্ড ক্যানিং ও তৎকালীন পার্লামেন্ট সদস্য লর্ড গ্রেনভিল হিন্দু পেট্রিয়ট ও তার সম্পাদকের প্রতি মুগ্ধ ও প্রসন্ন হয়েছিলেন। তার ওপর হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণের ফলে পত্রিকাটি বেশিদিন চালানো যায়নি।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা: উনিশ শতকের বাংলার একটি প্রভাবশালী পত্রিকা হল 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'। ১৮৬৩ সালে এপ্রিলে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। ১৮৬৪ সালের জুন-জুলাই মাসে এটি পাক্ষিক ও পরে সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়। গ্রামবার্তার প্রবন্ধগুলি ছিল মূলত সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মির মুশারফ হোসেন ও জলধর সেন এই পত্রিকায় প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। কাঙাল হরিনাথ সম্পাদক থাকাকালীন বাংলার শিক্ষার অগ্রগতি ও শোষণের বিরুদ্ধে পত্রিকায় নানা লেখা তুলে ধরেছিলেন। তিনি তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির ভ্রান্ত নীতি তুলে নেওয়ার পাশাপাশি নীলচাষিদের ওপর ব্রিটিশ ও সুদখোর মহাজনদের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। গ্রামবাংলায় শিক্ষাবিস্তার, শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অত্যাচারিত অসহায় কৃষকদের রক্ষার হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল ১ পয়সা মূল্যের এই সাপ্তাহিক পত্রিকা।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল ২০১৭

মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট

আমরা আগে জেনেছি কীভাবে Power Point-এ নতুন স্লাইড নিতে হয়। কিন্তু নতুন স্লাইড কীভাবে নিতে হয় তা যেমন জানা প্রয়োজন, তেমন স্লাইড ডিলিট কীভাবে করতে হয় সেটি জানা না থাকলে প্রেজেন্টেশন তৈরিতে বাধা আসতে পারে। তাই এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব কীভাবে Power Point-এ স্লাইড ডিলিট করতে হয়। তাহলে জেনে নেওয়া যাক স্লাইড ডিলিট করার নিয়ম সম্পর্কে।

Power Point-এ স্লাইড ডিলিট করা কোনও জটিল বিষয় নয়, ধরুন আপনি একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য অনেকগুলো স্লাইড নিয়েছেন। কিন্তু কোনও একটি স্লাইড কারণবশত ডিলিট করা প্রয়োজন পড়েছে।

সেক্ষেত্রে স্লাইডটির উপরে ক্লিক করে সেটি সিলেক্ট করুন। কিন্তু কীভাবে বুঝবেন যে স্লাইডটি সিলেক্ট হয়েছে? সেটি বুঝতে হলে স্লাইডটিতে ক্লিক করার পর লক্ষ করে দেখুন স্লাইডটি হলুদ কালার ধারণ করেছে, কিন্তু অন্যান্য স্লাইডগুলো তা করেনি। এবার স্লাইডটি সিলেক্ট করার পর কিবোর্ডে Delete বাটন প্রেস করুন, তাহলে স্লাইডটি ডিলিট হয়ে যাবে। একই ভাবে আপনার প্রয়োজন মতো যে কোনও স্লাইড সিলেক্ট করে ডিলিট করতে পারবেন। এছাড়াও আপনি চাইলে ভিন্ন ভাবেও স্লাইড ডিলিট করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে স্লাইডটিতে ক্লিক করে তার উপরে রাইট ক্লিক করুন, তাহলে একটি অপশন মেনু আসবে। অপশন মেনুতে Delete Slide-এ ক্লিক করলে স্লাইডটি ডিলিট হয়ে যাবে।

এবার আলোচনা করব কীভাবে Power Point ওপেন ও সেভ করতে হয় সে সম্পর্কে। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে Power point ওপেন ও সেভ করবেন ?

Power Point ওপেন করার নিয়ম:

Power Point প্রোগ্রামটি ওপেন করার পূর্বে অবশ্যই Microsoft Office প্রোগ্রামটি ইনস্টল থাকাটা আবশ্যক। যদি Microsoft Office প্রোগ্রামটি ইনস্টল করা থাকে তাহলে, Power Point প্রোগ্রামটি ওপেন করার জন্য টাস্ক বারের Start মেনুতে ক্লিক করুন। Start মেনুতে ক্লিক করার পর মেনু বারের নীচের অংশে All Program-এ ক্লিক করুন। তাহলে ইনস্টল করা সকল প্রোগ্রামের একটি চার্ট আসবে, সেখানে Microsoft Office প্রোগ্রামটি খুঁজে বের করে তাতে ক্লিক করুন। দেখবেন অফিস প্রোগ্রামের ভেতরে যে সকল বিষয়গুলো আছে সেগুলো দেখাবে, তারপর Power Point-এ ক্লিক করুন। তাহলে Power point প্রোগ্রামই ওপেন হয়ে যাবে।

Power Point সেভ করার নিয়ম:

MS Word ও MS Excel ফাইলগুলো যেভাবে সেভ করতে হয় একই ভাবে Power Point ফাইলটিও সেভ করতে হয়। প্রথমে File অপশনে ক্লিক করুন। যে অপশন মেনুটি আসবে সেখানে Save-এ ক্লিক করলে ফাইলটি সেভ হয়ে যাবে। এছাড়াও File থেকে Save as-এ ক্লিক করুন, একটি ডায়ালগ বক্স আসবে সেখানে File Name ঘরে ফাইলটির একটি নাম দিন তারপর OK তে ক্লিক করলে ফাইলটি সেই নামে সেভ হয়ে যাবে। এর যদি শর্টকাট কি ব্যবহার করতে চান, তাহলে Ctrl+S বাটন প্রেস করলে ফাইলটি সেভ হয়ে যাবে।

এছাড়াও Power Point-এ প্রেজেন্টেশন ফাইলটি ক্লোজ করার জন্য MS Word ও MS Excel-এ যেভাবে ফাইল ক্লোজ করতে হয় একইভাবে Power Point-এর ক্ষেত্রেও একই ভাবে ফাইল ক্লোজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে ফাইলের ডানপাশে লাল ক্রসচিহ্নে ক্লিক করুন অথবা শর্টকাট কি Ctrl+W বাটন প্রেস করেও ফাইলটি ক্লিক করতে পারবেন।

ইমেজ ইনসার্ট

প্রেজেন্টেশনের জন্য ব্যবহৃত স্লাইডগুলোর মধ্যে যে স্লাইডে Image Insert করবেন সেই স্লাইডটি সিলেক্ট করুন। তারপর Insert ট্যাব থেকে Images গ্রুপের Picture অপশনে ক্লিক করুন, একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। ডায়ালগ বক্সে আপনার প্রয়োজনীয় ছবিটি বের করে সেটিতে ক্লিক করে সিলেক্ট করুন, তারপর Insertঅপশনে ক্লিক করুন। দেখবেন আপনার সিলেক্ট করা ছবিটি স্লাইডে চলে এসেছে।

এবার আপনি মাউস ব্যবহার করে আপনার প্রয়োজন মতো আকার দিয়ে ছবিটি স্লাইডে সংযোগ করুন।

ভারী স্কুলব্যাগ

আপনার সন্তানকে কুঁজো করে দিচ্ছে না তো?

আর সাধারণ ব্যাগ হোক, তা একটি শিশুর মোট ওজনের দশ ভাগের বেশি হতে পারবে না। সে হিসাবে একটি শিশুর ওজন যদি পনেরো কেজি হয়, তাহলে তার স্কুলব্যাগের ওজন যেন অবশ্যই দেড় কেজির নীচে থাকে। অতিরিক্ত ওজন বহন থেকে শিশুদের দূরে রাখতে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্যথায় তা শিশুর নানা শারীরিক জটিলতা তৈরি করতে পারে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের এই মতামত বা পরামর্শ ক'জন মেনে চলে। বলতে পারেন, কেউই মানেন না। কারণ, আজ ক্লাস নাইন বা টেন-এর একজন পড়ুয়ার ব্যাগ এতটাই ভারী হয় যে, তারা প্রায়ই বাড়ি ফিরেই বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। দেখা যায়, শুধু স্কুলে যে সমস্ত পিরিয়ড থাকে সেগুলোর জন্যই এক-একটি সাবজেক্টের দু-তিনটি বই-সহ তিন-চারটে খাতা নিতে হয় পড়ুয়াদের। এর সঙ্গে ডায়েরি, প্র্যাকটিস বুক ইত্যাদি তো রয়েছেই। অন্যদিকে, আজকাল বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের প্রোজেক্ট করতে দেওয়া যেন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এই প্রোজেক্টের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও তাদের বহন করে নিয়ে যেতে হয় স্কুলে। ভেবে দেখুন, রোজ স্কুলে অন্তত সাতটা পিরিয়ড হয়। অর্থাৎ, শুধু ১৩-১৪টি বই-ই তাদের রোজ স্কুলে নিতে হয়। এর উপর রয়েছে প্রায় কুঁড়িটি খাতা ও সঙ্গে ডায়েরি বুক, যেখানে আজকাল হোমওয়ার্ক টুকে আনতে হয়। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই একজন পড়ুয়ার কতটা ওজন রোজ বহন করতে হয় তা সহজেই অনুমেয়।

প্রশ্ন হয়, কেন এতগুলি বই তাদের নিয়ে যেতে হয় রোজ? একটি সাবজেক্টের একটি বই এবং ক্লাসওয়ার্ক ও হোমওয়ার্কের খাতা নেওয়াই কি যথেষ্ট নয়? এই বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তো বটেই, এমনকী অভিভাবকদেরও কোনও অভিযোগ করতে শোনা যায় না। প্রত্যেক অভিভাবকই হয়তো নিজের সন্তানের জন্য শুধু হাহুতাশ করেই ক্ষান্ত থাকেন। তাই অভিভাবকদের উচিত এই বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা। সন্তান যেহেতু তাঁদের, তাই তাঁদেরই এক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া উচিত নয় কি? সবাই বিষয়টি নিয়ে ভুক্তভোগী হলেও, কেউই অভিযোগের আঙুল তোলেন না কেন? অভিভাবকদের উচিত সন্তানের স্কুলব্যাগ বহন করে স্কুল বাসে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে সমস্যাটি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা। অভিভাবকরা সমবেত হয়ে এর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালে অবশ্যই এই ক্ষেত্রে হয়তো পদক্ষেপ নেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

আমরা জানি, আমাদের দেশে লেখাপড়া নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। একাংশ স্কুলে যথেষ্ট শিক্ষক নেই, যাঁরা আছেন তাঁরাও যে সবসময় পড়াতে পারেন তা নয়, পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের কোচিং সেন্টারে পাঠিয়ে তাদের শৈশব থেকে সব আনন্দ কেড়ে নেন। ছেলেমেয়েরা বইয়ের ভারে কুঁজো হয়ে যায়, তারপরও তাদের গাইড বুক মুখস্থ করতে হয়। এতশত সমস্যার মধ্যে ভারী স্কুলব্যাগের সমস্যা তেমন কোনও বড় সমস্যা মনে না হলেও, অবহেলা করার মতো বিষয়ও নয়। কিন্তু এত কিছুর পরও আমরা কখনোই হতাশা প্রকাশ করিনি। কারণ আমরা জানি, লেখাপড়া নিয়ে এই সমস্যাগুলো একটুখানি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলেই সমাধান করে ফেলা যায়। আগে হোক, পরে হোক এই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। এবং এই আশা নিয়েই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সন্তানের ও দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখি।

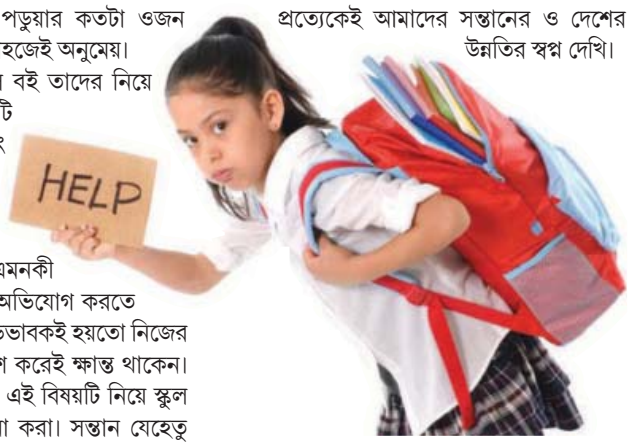

বাংলা ব্যাকরণ: ভাষা ও উপভাষা

আজ আমরা নবম শ্রেণির সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ব্যাকরণের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই জানা প্রয়োজন যে, ভাষা কাকে বলে?

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত অনুযায়ী মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।

ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি– (ক) ভাষা বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের প্রতীকের সমষ্টি। (খ) ভাষায় ধ্বনিসমূহের একটি নির্দিষ্ট অর্থ থাকবে। (গ) ভাষা কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত ও বিশেষ জনসমাজে সর্বজনগ্রাহ্য। (ঘ) ভাষা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টির দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে এবং অন্যের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

উপভাষা বলতে আমরা কী বুঝি?

কোনও ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষা-ছাঁদকে উপভাষা বলে। উপভাষার দু'টি বিভাগ–অঞ্চলভিত্তিক বা Regional Dialect, সমাজভিত্তিক বা Social Stratification Dialect।

উপভাষার বৈশিষ্ট্য: (ক) উপভাষা একটি আদর্শ ভাষার আঞ্চলিক রূপ। (খ) উপভাষা আদর্শ ভাষাকে ছাড়িয়ে যায় না। (গ) উপভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাধান্য পায়। (ঘ) উপভাষা অঞ্চল বিশেষের কথ্য ভাষা যদিও এখন উপভাষাকে ভিত্তি করে সাহিত্য রচিত হচ্ছে।

ভাষার দু'টি রূপ–কথ্যভাষা ও লেখ্যভাষা। মানুষের মুখে মুখে যে ভাষার ব্যবহার হয়,তাকে বলে মৌখিক ভাষা বা কথ্যভাষা।

বাংলায় মোট পাঁচটি উপভাষা আছে।

১) রাঢ়ী– মধ্য পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম রাঢ়ী: বীরভূম, পূর্ব বাঁকুড়া, বর্ধমান। পূর্ব রাঢ়ী: কলকাতা,দঃ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ)। (২) বাঙগালি: পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম)। (৩) বরেন্দ্রী– উত্তরবঙ্গ (মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহি, পাবনা)। (৪) ঝাড়খণ্ডী– দক্ষিণ- পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ (মানভূম, সিংভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর)। (৫) কামরূপী বা রাজবংশী– উত্তর-পূর্ববঙ্গ (জলপাইগুড়ি, রংপুর, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, কোচবিহার)।

ভাষার সঙ্গে উপভাষার সম্পর্ক: মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ, বহুজন বোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই হল ভাষা। কোনও ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষা ছাঁদকে উপভাষা বলে। একই ভাষার অন্তর্গত কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য উপভাষায় থাকবে।

১) রাঢ়ী উপভাষা পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলায় প্রচলিত? রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক পরিচয় দাও।

উত্তর: রাঢ়ী উপভাষা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, পূর্ব বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত আছে।

রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: (১) রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রথম বৈশিষ্ট্য হল 'অ' স্থলে 'ও' উচ্চারণ। যেমন: হল>হলো, অতুল>ওতুল, অনু>ওনু, মন>মোন (২) রাঢ়ী উপভাষায় অভিশ্রুতির প্রয়োগ হয়। যেমন: করিয়া>কইর্যা>করে। চারি> চাইর> চার। (৩) হ-কার লোপ পায়। যেমন, তাহার>তার, দহ>দ, প্রহ্লাদ> প্রল্লাদ।

রাঢ়ী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: (১) এই উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে গুলি, গুলা, দের প্রভৃতি বিভক্তি প্রয়োগ হয়। যেমন, মেয়েগুলি, আমাদের। (২) মুখ্যকর্মে কোনও বিভক্তি যোগ হয় না কিন্তু গৌণ কর্মে 'কে' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন, কমলবাবু রতনকে অঙ্ক শেখাচ্ছেন। (৩) রাঢ়ী উপভাষায় অধিকরণ কারকে 'এ' বা 'তে' বা 'এতে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন, ঘরে এসো। ঘরেতে ভাত নেই।

বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: (১) বঙ্গালী উপভাষায় কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন, রাম আইসে। (২) অধিকরণ কারকে এ, তে, ত বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন জলে ডুইব্যা মর।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: (১) বঙ্গালী উপভাষায় অপিনিহিতির প্রয়োগ আছে। যেমন, করিয়া>কইর্যা, ডুবিয়া>ডুইব্যা। ২) বঙ্গালী উপভাষায় শ, স-এর স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়। যেমন, হালার মাছ ধইর্যা জুত নাই।

বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য: বরেন্দ্রী উপভাষা মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রচলিত আছে।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: (১) বরেন্দ্রী উপভাষায় সামান্য অতীতকালে 'লাম' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন, খেলাম। (২) অধিকরণকারকে করণ 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন, ঘরত (ঘরে)

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: (১) বরেন্দ্রী স্বরধ্বনি অনেকটা রাঢ়ীরই মতো। অনুনাসিক স্বরধ্বনি রাঢ়ীর মতো বরেন্দ্রীতেও রক্ষিত আছে। (২) স্বঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (ঘ,ঝ,ঢ,ধ,ভ) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে। শব্দের মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে। যেমন: বাঘ>বাগ।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল ২০১৭

উত্তরণ ক্যুইজ

১) শ্রেণিবিন্যাসের একককে কী বলে?
২) বদ্ধ জলাশয়ে শৈবালের বৃদ্ধিকে কী বলা হয়?
৩) শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকায় কীসের পরিমাণ বেশি থাকে?
৪) শ্বেত কণিকা কী পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে?
৫) মাইটোকন্ড্রিয়ায় শতকরা কত ভাগ প্রোটিন থাকে?
৬) নীল জবাফুলের পাপড়িতে কী প্লাসটিড থাকে?
৭) ভৌগোলিক বাধার কারণে সৃষ্ট প্রজাতিকে কী বলে?
৮) নিউক্লিয়াসে শতকরা কত ভাগ প্রোটিন থাকে?
৯) গ্রিনহাউস গ্যাস কোনটি?
১০) ক্লোরিন গ্যাসের প্রভাবে কী রোগ হতে পারে?
১১) গ্যাস্ট্রুলা দশায় কটি স্তর থাকে?
১২) সিলিকা কোষ কোন উদ্ভিদে পাওয়া যায়?
১৩) প্রাণীর দেহের কঠিনতম পদার্থ কী?
১৪) কিছুক্ষণের জন্য শ্বাসক্রিয়া বন্ধকে কী বলে?
১৫) পিত্তরসের মধ্যে জলের পরিমাণ কত?
১৬) ক্ষুদ্রতম ভাইরাসের নাম কী?
১৭) কোন প্রকার আলোতে বেশি সালোকসংশ্লেষ ঘটে?
১৮) ক্লোরোপ্লাস্টিডের কোথায় ক্লোরোফিল থাকে?
১৯) কোন উৎসেচক শিশুদেহে দুগ্ধ প্রোটিন পরিপাক করে।
২০) মস্তিষ্কের কোন প্রকোষ্ঠে পিটুইটারি গ্রন্থি অবস্থান করে?
২১) প্লাসমোডিয়ামের কোন দশাকে ফিডিং ফেজ বলে?
২২) কোন যন্ত্রাংশের সাহায্যে রেশম মথের সুতো বার করা হয়?
২৩) ভারতের প্রথম জিন প্রযুক্তিজাত উদ্ভিদ কোনটি?
২৪) লাইকেন কোন দূষণের সূচক?
২৫) অধাতুর দু'টি ধর্ম কী?
২৬) সবচেয়ে কঠিন অধাতু কোনটি?
২৭) তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম অধাতু কোনটি?
২৮) সবচেয়ে ভারী ধাতু কোনটি?
২৯) অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণে ধনাত্মক আয়ন হিসাবে কোন আয়ন উৎপন্ন হয়?
৩০) জলের আণবিক গুরুত্ব কত?
৩১) অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে বদলে কী রং করে?
৩২) কোন পদার্থ অক্সিজেনকে শোষণ করতে পারে?
৩৩) সাপ সম্পর্কে পড়াশোনাকে কী বলে?
৩৪) লোহার সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প যুক্ত হয়ে কোন অক্সাইড তৈরি হয়?
৩৫) পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন তৈরির শর্ত কী?

৩৬) অ্যাটাকামাইট কোন ধাতুর আকরিক?
৩৭) ফসজিনের রাসায়নিক নাম কী?
৩৮) হাইড্রোজেনের থেকে ভারী হওয়া সত্ত্বেও কোন গ্যাস বেলুনে ব্যবহার করা হয়?
৩৯) পর্যায় সারণিতে সবচেয়ে তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল কোনটি?
৪০) বায়ুমণ্ডলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ?

উত্তর: ১) ট্যাক্সন। ২) ইউট্রফিকেশন। ৩) খনিজ লবণের। ৪) ফ্যাগোসাইটোসিস। ৫) ৭০%। ৬) ক্রোমোপ্লাস্টিড। ৭) অ্যালোপেট্রিক প্রজাতি। ৮) ১৫%। ৯) কার্বন ডাই-অক্সাইড। ১০) কংজাইটিভাইটিস। ১১) ৩টি। ১২) ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে। ১৩) এনামেল। ১৪) অ্যাপনিয়া। ১৫) ৯০-৯৮%। ১৬) পারভো ভাইরাস। ১৭) লাল আলোতে। ১৮) গ্রানা। ১৯) রেনিন। ২০) সেল্লা টর্সিকা। ২১) ট্রফোজয়েট। ২২) স্পিনারেট। ২৩) বিটি কটন। ২৪) বায়ুদূষণ। ২৫) সাধারণত অনুজ্জ্বল আর তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী নয়। ২৬) হীরক। ২৭) গ্রাফাইট। ২৮) লেড। ২৯) হাইড্রোজেন। ৩০) ১৮। ৩১) লাল। ৩২) ক্ষারীয় পটাসিয়াম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ। ৩৩) সার্পেন্টোলজি। ৩৪) সোদক ফেরিক অক্সাইড। ৩৫) সংস্পর্শ শর্ত ও তাপ ৩৬) তামা। ৩৭) কার্বনিল ক্লোরাইড। ৩৮) হিলিয়াম। ৩৯) ফ্লোরিন। ৪০) ০.৯৫%।

শিক্ষার আনাচে-কানাচে

নবনীতা চৌধুরী

পুঁথিগত ও প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন জীবনে সবচেয়ে আগে, নইলে স্বাবলম্বী হওয়া যায় না। এই দুই শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে তখনই যখন আচরণগত শিক্ষা ও বোধের শিক্ষা যুক্তিসংগত ভাবে ওই দুই শিক্ষাকে পরিচালনা করতে পারে।

অভ্যাস মানুষের জীবনে চরিত্র গঠন করে। ছাত্রজীবনে যে অভ্যাস যত প্রকট হবে তার প্রতিচ্ছবি পড়বে পরবর্তী জীবনে। তাই জীবনে সুখের চাবিকাঠি থাকে ছাত্রজীবনের শিক্ষায়।

শিক্ষার ধরনটা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। পরীক্ষামূলক যেমন, প্রয়োগমূলকও তেমনই। পরীক্ষার ধরন, প্রশ্নের ধরন, উত্তর লেখার ধরন, পরীক্ষার পদ্ধতি, সবই বদল হয় কিছু বছর পর পর। শিক্ষাবিদরা বা বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হতে পারেন না যে কোন পদ্ধতিটা পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত বা প্রাসঙ্গিক। কারণ পরিবেশ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। সমাজ পরিবর্তনশীল। সেই সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল আমাদের চিন্তা, যুক্তি ও মননশীলতা। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই পরিবর্তনশীলতার মধ্যে নিজের মন ও চিন্তাশক্তি সময়মাফিক ও প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তনীয় করে তোলা।

অনেক মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী আছে যারা কর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত। কিন্তু বাস্তব জীবনে ছোট ছোট ঘটনাও তাদের ব্যক্তিত্বকে দোলাচলতায় ভোগায়।

পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা, বাবা-মায়ের ও পরিবারের শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষা ও পরিবেশের শিক্ষা সব যখন একই ছন্দে কাজ করে তখনই একটা মানুষ পরিপূর্ণ শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

ছাত্রজীবন থেকেই একটা সুন্দর রুটিনমাফিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। এই রুটিনমাফিক পথটা কিন্তু তৈরি হয় বাড়ি থেকে। এই শিক্ষার প্রথম শিক্ষাগুরু হলেন মা ও বাবা। যতদিন যাচ্ছে সময় ও পরিবেশ ততই দ্রুত বদলাচ্ছে। বদল আসছে জীবনযাপনের প্রক্রিয়ারও। শিশু বয়স থেকেই এখন সময় কাটানোর সঙ্গী হয়ে উঠেছে ভিডিও গেম, নয়তো মোবাইল গেম। যথাযথ ব্যবহার জানার আগেই যখন মুঠোবন্দি হচ্ছে এসব যন্ত্র তখন তার কুপ্রচার বা অপরিমিত ব্যবহারের প্রভাব যে রোজকার জীবনে পড়বে সেটা তো খুব স্বাভাবিক। তাই এই যন্ত্রটি সন্তানের হাতে তুলে দেওয়ার আগে বাবা-মায়ের নিজের এ সম্পর্কে সম্যক ব্যবহারের জ্ঞান থাকা খুব জরুরি।

একটা নেশা দৈনন্দিন জীবনে থাকা জরুরি। নইলে দৈনন্দিন কাজটা ভীষণ বোঝা হয়ে দাঁড়ায় দিনের পর দিন। সে নেশা গান শোনা, বইপড়া, ছবি আঁকা, বাগান করা, পোষ্য পোষা যে কোনওটাই হতে পারে। তবে বইপড়ার নেশাটা যদি খুব ছোট বয়স থেকে অভ্যেস করানো যায় তার মতো ভালো নেশা বোধহয় আর কিছুতে হয় না। চিন্তাশক্তি আর যুক্তি বোধকে উন্নত করতে এই নেশার জুড়ি নেই।

পরিবেশের হাতছানিকে উপেক্ষা করা এখন খুব কঠিন। এর জন্যই কত সম্ভাবনাময় জীবন লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগেই হারিয়ে যাচ্ছে। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে এই হাতছানি যেন আরও দ্রুত থাবা বসায়। আগের দিনগুলোয় একটা শিশুর কাছে শিক্ষাক্ষেত্র হিসেবে অনেকগুলো জায়গা ছিল। পরিবার ও পাড়ার গুরুজনেরা, দাদা-দিদিরা, এমনকী পাড়ার বন্ধুরাও। তাই বাবা-মায়ের ভার অনেক কম ছিল। এখন তিনজনের সংসারে সব কিছু সামলাতে হয় বাবা-মাকেই। একি কম কথা? সারাদিন দৌড়নো ক্লান্ত বাবা-মায়েদের লক্ষ্য একটাই, সন্তানকে যোগ্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

পরিবর্তন আরও আসুক। আরও নতুন নতুন উদ্ভাবন আর প্রয়োগে আমরাও পটু হই। দ্রুততা না থাকলে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা অসম্ভব। সেই দ্রুততা মনে মনে গ্রহণ করি আনন্দেই। তার সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনশীলতাকে গ্রহণ করেই সামনে এগোতে হবে। ভালো রেজাল্ট, ভালো পড়াশোনা আর ভালো চাকরি—এরপরও তো আরও একটা বড় কাজ বাকি থাকে। একই রকম ভাবে আরও একটা ভালো মানুষ তৈরি করা।

উত্তর এডু টিপস

পরীক্ষা সম্পর্কীয় ভয়রোগ বা ভীতিরোগ

সাম্প্রতিককালে একটি উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত ভীতি সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে যেটা বলতে হয় সেটি হচ্ছে পরীক্ষা সম্পর্কীয় ভয়রোগ বা ভীতিরোগ। পরীক্ষা সম্বন্ধে একটা সাধারণ ভয় বা চিন্তা মনে বিরাজ করতে পারে, যা পরীক্ষার জন্য দরকারি। কিন্তু যখন এই ভয় তার স্বাভাবিক স্তর অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে যায় এবং পরীক্ষা দেওয়াই ছাত্রের জন্য ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে বা পরীক্ষার কথা শুনলেই সে নানারকম শারীরিক অসুস্থতায় ভুগতে থাকে তখনই তাকে আমরা ভীতিরোগ বা ভয়রোগ বা পরীক্ষাভীতি বলতে পারি।

রুটিন মাফিক পড়ালেখা

পরীক্ষা শুরুর পূর্বমুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদের যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি ভীত করে তোলে সেটি হল সিলেবাস শেষ করতে না পারা। এ নিয়ে অযথা চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। যে ক'টা দিন পরীক্ষার্থীর হাতে আছে সেই ক'টা দিন রুটিনমাফিক চললেই সংকট অনেকটা কেটে যেতে পারে।

তবে রুটিন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

- কোন সময় কী বিষয় পড়বে তার একটি তালিকা করা প্রয়োজন।
- যে বিষয়টির পড়া অনেকটা বাকি রয়ে গেছে সেই বিষয়টির জন্য অবশ্যই বেশি সময় দিতে হবে।
- শুধু পড়ে গেলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে লেখারও অভ্যাস তৈরি করতে হবে।
- পরীক্ষার আগে অনেক ছাত্রছাত্রীকে বলতে শোনা যায়, যা পড়েছি তার সবই ভুলে গেছি। সবকিছু যাতে ভুলে না যাই এর জন্য প্রাত্যহিক রুটিনে একটা সময় রাখতে হবে, যে সময়টাতে সে কেবল পুরনো পড়াগুলো ঝালিয়ে নেবে।
- যারা সায়েন্সের ছাত্রছাত্রী, যাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা মুখোমুখি হতে হয়, যাদের আঁকাজোকার ব্যাপার আছে সে বিষয়গুলোকে কোনোভাবেই অবহেলা করা চলবে না। প্রতিদিন কিছুটা সময় এগুলোর জন্যও দিতে হবে।
- পরীক্ষার আগের রাতে যদিও সবকিছু রিভিশন দেওয়া চাই, কিন্তু এজন্য কোনোভাবেই অতিরিক্ত রাত করা যাবে না।

শরীরের প্রতিও যত্নশীল হতে হবে

এ সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শরীরে যাতে কোনও রোগ আক্রমণ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা। বিশেষ করে জলবাহিত রোগ যেমন— ডায়রিয়া, ফুড পয়জনিং, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস বা জন্ডিস সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এই সব রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য কোনোক্রমেই বাসি খাবার, বাইরের খোলা খাবার খাওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে ফুটনো বিশুদ্ধ জল।

- পরীক্ষার সময় শরীরের জন্য বাড়তি পুষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। তবে যারা নিয়মিত সুষম খাবার খেয়ে থাকে তাদের জন্য খুব বেশি বাড়তি খাবারের দরকার নেই। কিন্তু মস্তিষ্ককে সুস্থ ও কার্যকর রাখার জন্য শস্যদানাজাতীয় খাবার, দুধ, সবজি, ডিম খাওয়া খুব প্রয়োজন।
- পরীক্ষার সময় পড়াশোনার সময়টি নির্দিষ্ট করে অতিরিক্ত রাতজাগা থেকে বিরত থাকতে হবে। অতিরিক্ত রাত জেগে পড়াশোনা অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। মনে রাখতে হবে, পড়াশোনায় মনোনিবেশের জন্য পর্যাপ্ত ঘুমেরও প্রয়োজন রয়েছে।
- প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত আধঘণ্টা আগে পড়াশোনার পর্ব শেষ করে কিছুক্ষণ রিলাক্স করতে হবে। কিছুটা সময় নিজের মতো উপভোগ করতে হবে। এতে রাতের ঘুমটা ভালো হবে।
- টেনশন কমানোর জন্য যোগা বা যোগব্যায়াম কিংবা মেডিটেশন করা যেতে পারে। এতে শরীর কিছুটা রিলাক্স হয়। মেডিটেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এ সম্পর্কে আগে থেকে খোঁজখবর থাকলে ভালো। মেডিটেশন সম্পর্কে জানা না থাকলে দৈনিক ১৫ মিনিট চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে বুক ভরে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে নিতে ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে।

পরীক্ষাভীতি দূর করতে যা করতে হবে

পরীক্ষা বিষয়টিকে সহজে স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। নিজের আকাঙ্ক্ষা কমাতে হবে। মূলত, আকাঙ্ক্ষার কারণে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। আকাঙ্ক্ষা কমলে চাপও কমবে, এতে পরীক্ষাভীতিও কমে যাবে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা মানসিক চাপমুক্ত পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের পরীক্ষার ফল ভালো হয়েছে।

পরীক্ষাভীতি কাটানোর ভালো উপায় হল, আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া। যদি বছরের শুরু থেকেই একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সঠিকভাবে পড়ালেখা করা যায়, তাহলে পরবর্তীকালে পরীক্ষাভীতি থাকে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিংবা সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত পড়ালেখার প্রয়োজন নেই। লেখাপড়ার জন্য দৈনিক ছয় থেকে আট ঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল ২০১৭

বিতর্ক যখন শিক্ষা নিয়ে | আজকের বিষয়: পড়াশোনার পাশাপাশি খেলার প্রয়োজনীয়তা

আজকালের বাচ্চারা হয়তো একটু বেশিই ব্যস্ত থাকে লেখাপড়া নিয়ে। এই ভারী ব্যাগ, বই-খাতা, খেলাধুলার যেন ফুরসতই নেই। খেলাধুলো তো দূরের কথা, বাড়িতে সবার সঙ্গে মন খুলে কথা বলারও সুযোগ নেই তাদের। এখন প্রাইভেট, তো তখন স্কুল। এখন হোমওয়ার্ক, তো তখন প্রাইভেট টিচারের দেওয়া পড়া। এছাড়া যুগের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য অভিভাবকেদের চাপিয়ে দেওয়া আরও নানাবিধ চাপ তো আছেই।

বাচ্চাদের যদি এখন কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, বাবু তুমি খেলাধুলা করো? শিশুটি যা উত্তর দেবে তার জন্য হয়তো আপনি মোটেও প্রস্তুত নন। আপনি হয়তো বলবেন, খেলো, কী খেলো, কোথায় খেলো? প্রশ্ন করলেই বলবে, কেন বাড়িতে বসে কম্পিউটারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে আপনার শিশুটি হয়তো এভাবেই ঝুঁকছে ইন্ডোর গেমের প্রতি। আবার জায়গা আর নিরাপত্তার অভাবে আপনিও হয়তো তাকে বাইরে যেতে দিচ্ছেন না। কিন্তু এতে মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে হতে পারে আপনার কোমলমতি শিশুটিকে। বাধাগ্রস্ত হতে পারে তার স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ। আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে অনেক।

প্রতিযোগিতার এই বাজারে অধিকাংশ শিশু এক কাঠামোবদ্ধ কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেক শিশু তো একটুও সময় পায় না প্রকৃতপক্ষে খেলার জন্য। কিন্তু শিশুর জন্মগত অধিকার হিসাবে তাকে শুধু খেলাধুলার মধ্যে বেড়ে উঠতে দেওয়ার পক্ষপাতী বিশেষজ্ঞরা। এ ব্যাপারে শিক্ষক, ছাত্র বা অভিভাবক, কে কী বলছেন জেনে নিই...

অসীমকুমার গায়েন (শিক্ষক)

পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলোও ছাত্রজীবনের একটা অপরিহার্য অংশ। তবে ইন্টারনেটের বিভিন্ন গেম, ভিডিও গেম বা অ্যান্ড্রয়েড গেমস শরীর সুস্থ রাখতে বা মন ও মননের বিকাশের কোনও ভূমিকা নেয় বলে আমার মনে হয় না। আমাদের সময়ে খেলাধুলো মানে বিকেলে খেলার মাঠে কতরকমের খেলা, শরীরচর্চা। একটা কম্পিউটারের সামনে বসে বা একটা বড় সাইজের মোবাইল হাতে নিয়ে মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত বা বিপর্যস্ত হওয়া ছাড়া কিছু হওয়া বলে আমার মনে হয় না। খেলার মাঠের বিকল্প কিছু হতেই পারে না। ইনডোর গেমস হোক, তবে অভিভাবকদের উচিত বাচ্চাদের পড়াশোনার পাশাপাশি আউটডোর গেমস-এ ইনভলভ করা।

অয়ন জানা (ছাত্র)

আমি পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলোতে সমান আগ্রহী। অ্যান্ড্রয়েডে যেমন অবসর সময়ে গেম খেলি, তেমনই সপ্তাহে কয়েকদিন মাঠে যাই খেলতে। মাঠে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট, ফুটবল খেলার মধ্যে একটা অন্যরকম আনন্দ আছে।

বিজয়া বিশ্বাস (অভিভাবক)

আসলে এখনকার বাচ্চারা একটু বুঝতে শিখলেই মোবাইল অপারেট করতে শিখে যায়। তাই অ্যান্ড্রয়েড গেমসে তারা হ্যাবিচুয়েটেড। তবে আমি অন্তত আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখি ও যেন অ্যাডিক্টেড না হয়ে পড়ে। আর প্রতি সপ্তাহে অন্তত তিনদিন ওকে মাঠে নিয়ে যাই খেলতে। কারণ আমার মনে হয়, খেলার মাঠে না গেলে একটা বাচ্চার মানসিক ও শারীরিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা আসে না।

উত্তরণ এডু টিপস

ইংরেজি শব্দ সহজে মনে রাখা

শব্দের আলাদা আলাদা উচ্চারণ

ইংরেজি বড় শব্দের বানান মুখস্থ করে মনে রাখা অনেক কষ্টসাধ্য একটা ব্যাপার। কষ্ট করে মনে রাখলেও অনেকেই এক-দু'দিনের ব্যবধানে তা ভুলে যায়। আসলে মুখস্থ করা কোনও সময়ই ইংরেজি শব্দ মনে রাখার গুরুত্বপূর্ণ কৌশল নয়। তাই মুখস্থ করার চেয়ে কয়েকটা ট্রিকস অ্যাপ্লাই করলে অনেক ফলপ্রসূ হয়। ইংরেজি শব্দ পড়ার সময় ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করলে যেমন সহজে শব্দের অর্থ পাওয়া যায়, তেমনি মুখস্থ করলেও সহজে মনে রাখা যায়। যেমন, Disappearing-এর অর্থ অদৃশ্য। এখন এটা মুখস্থ করতে কত সময় লাগে দেখো! আর এখন Dis-apppearing এভাবে পড়ো, দেখো কত সুবিধা হয়। এইভাবে ইংরেজি বড় শব্দগুলির অনুশীলন করো। দেখবে অনেক সহজে হয়ে যাচ্ছে এবং এটি অনেক ফলশ্রুত একটি ট্রিকস হবে।

ছবি সংযুক্ত করো

যখন আমরা কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত কোনও তথ্য যুক্ত করি তখন বিষয়গুলো আরও সহজ হয়ে যায় মনে রাখার জন্য। একইভাবে আমরা একটা শব্দের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু তথ্য যুক্ত করে শব্দ, শব্দের অর্থ, শব্দের ডচ্চারণ ইত্যাদিও মনে রাখতে পারি। যেমন Desest এবং dessert শুনতে একই রকম। কিন্তু একটির অর্থ মরুভূমি ও আরেকটির অর্থ খাবার শেষের মিষ্টি। অর্থের অমিলের সঙ্গে উচ্চারণগত দিক দিয়েও সমস্যা রয়েছে যদিও, দু'টি শব্দের সঙ্গে দু'টি ছবি যুক্ত করে দিলে দু'টির অর্থ মনে রাখা সহজ হয়ে যায়।

নিজে বাক্য তৈরি করো

সহজে ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ মনে রাখার জন্য অনেক ফলপ্রসূ একটি ট্রিকস হল, নিজে একটি শব্দের উচ্চারণ দিয়ে বাক্য তৈরি করা। এক্ষেত্রে ছোট একটা উদাহরণ দিলেই সব বুঝতে পারবে। যেমন Arithmetic- A Rat In The House Might Eat The Ice Cream। এখানে Arithmetic শব্দের অর্থ হল পাটিগণিত। এবার দেখো এই শব্দটির বানান মুখস্থ করা সহজ না A Rat In The House Might Eat The Ice Cream মনে রাখা সহজ? ট্রিকসটি অ্যাপ্লাই করে দেখো, নিজেই বুঝতে পারবে।

রেকর্ড করে শুনে মনে রাখো

এটি আরেকটি ইংরেজি শব্দের অর্থ মনে রাখার গুরুত্বপূর্ণ ট্রিকস। প্রথমে শব্দগুলোর উচ্চারণ শুদ্ধভাবে অর্থ-সহ রেকর্ড করে নাও। যেমন, Absure শব্দের অর্থ হল অযৌক্তিক বা হাস্যকর, Benevolent-এর অর্থ দয়ালু বা বদান্য। এবারে গান বা এফএম রেডিও শোনার মতো এগুলো শোনো। মনযোগ দিয়ে শুনলে দুই থেকে তিনবারেই শব্দ ও অর্থ আয়ত্ত হয়ে যাবে। আর শোনার পাশাপাশি লিখলে আরও তাড়াতাড়ি আয়ত্ত হয়।

প্রতিদিন অনুশীলন করো

মনে রাখার জন্য প্রতিদিন শব্দ অনুশীলন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উপরোক্ত সমস্ত কৌশল বানান মুখস্থ ও মনে রাখাতে সাহায্য করবে। কিন্তু তখনই সম্ভব, যখন নিয়মিত তা চর্চা করা হয়। নিয়মিত রুটিন মাফিক চর্চা না করলে এগুলো ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। এরজন্য সহজ কৌশলে যে শব্দের উচ্চারণ, অর্থ এবং সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ শিখেছ সেগুলো একটা আলাদা খাতা বা নোটপ্যাডে লিখে রাখো। এবার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ইংরেজি বানানের অক্ষর দিয়ে দাও এবং A-এর শব্দগুলো A নং পেজে, B-এর অর্থ B নং পেইজে এবং C-এর অর্থগুলো C নং পেজে লিখে রাখো। খাতা বা নোটপ্যাডের প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠা নং দাও এবং খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় রুল টেনে কত নং পৃষ্ঠায় কোন টপিক তা লিখে রাখো। এবার সকালে অন্তত এক ঘণ্টা দুটি ওয়ার্ডের সব শব্দের রিভাইস করো ও মনে রাখার চেষ্টা করো। তাহলেই দেখবে ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করা এবং শেখা তেমন কঠিন কাজ মনে হবে না।

বিদিশা রায়চৌধুরী

দেখতে দেখতে 'উত্তরণ'-এর পুরো একবছর হয়ে গেল। এই একবছর ধরে 'উত্তরণ' তোমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে কতটা সাহায্যে লেগেছে লিখে জানাও আমাদের।

সূচক নিয়ে সূচনা

দশম শ্রেণির জন্য রসায়ন নিয়ে কিছু কথা—

আয়তনিক বিশ্লেষণে (volumetric analysis) উপস্থিত থেকে রঙের পরিবর্তন দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমাপ্তি সূচক পদার্থকে সূচক বা ইন্ডিকেটর বলে।

সূচক অতি মৃদু জৈব অম্ল (Acid) বা ক্ষারক (base)। প্রধানত, দুই ধরনের সূচক হল (১) স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সূচক এবং (২) কৃত্রিম সূচক।

লিটমাস, হলুদ, জবাফুলের পাপড়ি হল প্রাকৃতিক সূচক, মিথাসল অরেঞ্জ, ফেনলফথেলিন, লিটমাস এগুলো হল কৃত্রিম সূচক।

কিছু সূচক ক্ষারে যোগ করলে সূচকের গন্ধ পরিবর্তন হয়। যেমন লবঙ্গ তেল, ভ্যানিলা, পেঁয়াজ এগুলোকে অলফ্যাক্টরি সূচক বলে। এবার একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলি।

সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে দু'ফোঁটা ফেনলফথেলিন দেওয়া হল। দ্রবণের রং গোলাপি হয়, এখন সেই দ্রবণে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করা হল। গোলাপি রং একসময় দেখা যায় না। আবার কয়েক ফোঁটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করা হল। বর্ণহীন দ্রবণ আবার একসময় গোলাপি হয়ে যাবে। তাহলে আমরা দেখলাম।

ক্ষারকীয় মাধ্যম + ফেনলফথেলিন —> গোলাপি রং

আম্লিক মাধ্যম + ফেনলফথেলিন —> বর্ণহীন রং এই এক্সপেরিমেন্টের কেমিস্ট্রি হল, দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়া হল, তা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে প্রশমন (Neutralization) করে, তারপর একফোঁটা অতিরিক্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে, ক্ষারকীয় মাধ্যমে, ফেনলফথেলিনের রং আবার গোলাপি হয়।

এ ধরনের আরেকটা সূচক হল মিথাইল অরেঞ্জ।

মনে রাখবে, ক্ষারকীয় মাধ্যম + মিথাইল অরেঞ্জ —> হলুদ রং

আম্লিক মাধ্যম + মিথাইল অরেঞ্জ —> লাল রং

তবে সবচেয়ে মজার সূচক হল ইডনিভার্সাল ইন্ডিকেটর। এটা দিয়ে আমরা কিন্তু আম্লিক মাধ্যম বা ক্ষারকীয় মাধ্যমের pH জানতে পারি।

মানিক চক্রবর্তী
শিক্ষক (রসায়ন)

হঠাৎ হয়ে যাওয়া আবিষ্কার *(দু'য়ের পাতার পর)*

পার্টিতে মজা করার একটি অনুষঙ্গ মাত্র। পার্টিতে এই গ্যাস ছড়িয়ে দিয়ে সবাই হাসিতে লুটিয়ে পড়ত। হোরাসের এক বন্ধু এরকমই এক অনুষ্ঠানে লাফিং গ্যাস একটু বেশিই শুঁকে ফেলেন এবং দুর্ঘটনাক্রমে নিজেই নিজের পায়ে বিরাট এক ক্ষত তৈরি করে ফেলেন। মজার বিষয় হল, অতিরিক্ত নাইট্রাস অক্সাইড নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণের ফলে তার শরীরের অনুভূতি-শক্তি সাময়িকভাবে চলে যায়। ফলে নিজেই নিজের পায়ে ক্ষত তৈরি করে ফেললেও হোরাসের সেই বন্ধুটি কিছুই টের পাননি। এই ঘটনা থেকেই অ্যানাসথেসিয়ার জন্য নাইট্রাস অক্সাইডের ব্যবহার শুরু হয়।

চুইংগাম: সময়টা ১৮৭০ সাল। থমাস এডাম নামের এক ভদ্রলোক দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনা কিছু চিকল গাছের রস নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল, একে রবারের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা। কিন্তু অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও তিনি ব্যর্থ হলেন। হতাশায় বেচারা থমাস সেই রস থেকে তৈরি আঠালো বস্তুটি আনমনেই মুখে নিয়ে চিবাতে শুরু করলেন। ভাবছিলেন কী করা যায়। হঠাৎই তার ঘোর কেটে গেল। আরে! মুখের ভেতর তিনি যে জিনিসটি চিবাচ্ছিলেন সেটি খেতে তো মন্দ না। আসল নতুন ব্যবসার চিন্তা। ফলে Adams New York No. 1 হচ্ছে বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাজারজাতকৃত চুইংগাম।

কৃত্রিম উজ্জ্বল বেগুনি রং: ম্যালেরিয়া সব সময়ই একটি ভয়াবহ রোগ হিসাবে পরিচিত ছিল। উইলিয়াম পার্কিন নামে এক ব্যক্তি চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন এর প্রতিষেধক উদ্ভাবনের। সে সময় সিনকোনা গাছের ছাল থেকে প্রাপ্ত কুইনাইন ম্যালেরিয়ার রোগীকে খেতে দেওয়া হত। কিন্তু সেই গাছ খুব সহজলভ্য ছিল না। পার্কিন চেষ্টা করছিলেন পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন তৈরি করার। ওষুধ উদ্ভাবন করতে গিয়ে পার্কিন দেখলেন, উজ্জ্বল বেগুনি রং গবেষণাগারের টেবিলের উপর ছড়িয়ে আছে। পার্কিন ভুলে গেলেন ম্যালেরিয়ার ওষুধ উদ্ভাবনের কথা। তিনি খুলে বসলেন কৃত্রিম বেগুনি রং তৈরির কারখানা আর হয়ে গেলেন বিরাট ধনী ব্যক্তি!

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল ২০১৭

জেনারেল নলেজ:

প্রজাপতি ভাই কোথায় পেলে এমন রঙিন পাখা!

প্রজাপতির জানা-অজানা নানান কথা লিখেছেন **বৃষ্টি ঘোষ**

হঠাৎ করে যদি কেউ প্রশ্ন করে রং-বেরঙের কোনও প্রাণীর নাম বলতে, তাহলে নিঃসন্দেহে সবার মনেই প্রজাপতির নাম ভেসে উঠবে। এত বেশি রঙের সমাহার আর কোন প্রাণীরই বা আছে? আকারে ছোট হলেও, এদের পাখায় রয়েছে একসঙ্গে হরেক রঙের সমাহার, যে কারণে দেখলেই মুহূর্তের মধ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়, মনে হয় একবার ছুঁয়ে দিতে পারলে মন্দ হত না। মজার ব্যাপার হল, পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এই প্রাণী সম্পর্কে বেশিরভাগ ঘটনাই আমাদের অজানা।

মেলানিন বা এরকম নানান ধরনের পিগমেন্টের কারণে আমাদের বা অন্যান্য অনেক প্রাণীকে আমরা সাধারণত অনেক রঙিন দেখে থাকি। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন যে, প্রজাপতির শরীরে এমন ধরনের কোনও বর্ণ কণিকা নেই। অর্থাৎ, প্রজাপতির নিজস্ব কোনও রং নেই। ব্যাপারটি আসলেই অবাক করে দেওয়ার মতো। এখন কথা হচ্ছে, তাহলে প্রজাপতির পাখায় এত রঙের ভিন্নতা এল কীভাবে?

সব প্রজাপতি 'লেপিডপ্টেরা' বর্গের অন্তর্গত। 'লেপিডপ্টেরা' হচ্ছে একটি ল্যাটিন শব্দ যা দু'টি গ্রিক শব্দ 'লেপিস' ও 'টেরন'-এর সমন্বয়ে গঠিত। 'লেপিস' অর্থ স্কেল বা আঁশ এবং 'টেরন' অর্থ ইউং বা পাখা। অর্থাৎ, শাব্দিক ভাবে 'লেপিডপ্টেরা' মানে হচ্ছে, আঁশযুক্ত পাখা। এই বর্গের অধীনে আরও একধরনের পতঙ্গ আছে, সেটি হচ্ছে মথ। সুতরাং বলা যেতে পারে, মথেরা হচ্ছে প্রজাপতির জাতভাই।

আমরা অনেক সময়েই খেলার ছলে কিংবা অন্য কোনও কাজে প্রজাপতি ধরেছি বা পাখাতে হাত লেগেছে। সবাই-ই হয়তো একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে যে, ওই সময়ে হাতে একধরনের রঙিন কিছু একটা লেগে যায়। আসলে এগুলোই হচ্ছে প্রজাপতির শরীরের আঁশ। এদের আকার এতটাই ছোট যে একটা ছোট প্রজাপতির পাখাতেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আঁশ থাকে। মূলত, এই আঁশগুলির জন্যই আমরা প্রজাপতিকে এত রঙিন দেখতে পাই। তবে প্রজাপতি ভেদে এসব আঁশের সজ্জায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়, যার জন্য যখন আলো এসে পড়ে তা প্রতিসরণ ও বিচ্ছুরণের মাত্রার অনেক বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আর এই জন্যই আমরা একেক প্রজাপতিকে একেক রঙে দেখতে পাই। আলোর এই ধর্মকে ইরিডিসেন্ট বলে।

প্রকৃতপক্ষে প্রজাপতির পাখা হচ্ছে স্বচ্ছ, বর্ণহীন পর্দা, যেখানে বিভিন্ন ধরনের আঁশ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সজ্জিত হয়ে আলোর ইরিডিসেন্ট ধর্মের মাধ্যমে নানান রঙের সৃষ্টি করে। গড়ে এসব আঁশগুলো লম্বায় ১০০ মাইক্রোমিটার ও চওড়ায় ৫০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। আলো যখন বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত এসব আঁশের উপর এসে পড়ে, তখন বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বিচ্ছুরণ করে, যার ফলে আমাদের চোখে বিভিন্ন রং এসে ধরা পড়ে।

অনেক সময় দেখা যায়, একই প্রজাতির প্রজাপতি শূককীট থেকে বের হবার পর এর রং আবার কিছুদিন পর আরেকটু গাঢ় রঙে পরিবর্তিত হয়। এটাও এসব আঁশের কারণেই হয়ে থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এদের পাখায় আঁশের পরিমাণ কমতে থাকে। আবার সূর্যের আলোর তীব্রতার জন্যও এদের বিচ্ছুরণ ক্ষমতার অনেক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

প্রজাপতির সংখ্যা

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় দু'লক্ষ প্রজাতির প্রজাপতির দেখা মেলে। এর মধ্যে আমাদের দেশে আইইউসিএন রেড লিস্টের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৩০৮ প্রজাতির প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রজাপতির জীবনকাল ও জীবনচক্র

প্রজাপতি কতদিন বাঁচে এটা নিয়ে অনেক গুজব রয়েছে এবং কেউ কেউ মনে করেন, যে মাত্র সাতদিনেই প্রজাপতির জীবনকালের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু না, প্রজাপতির জীবনচক্রের চারটি ধাপ শেষ হতে প্রায় এক মাস সময় লাগে। অর্থাৎ, এরা সাধারণত এক মাস বাঁচে।

প্রজাপতির জীবনচক্রের চারটি ধাপ হচ্ছে, ডিম, শুঁয়োপোকা, পিউপা এবং পরিণত প্রজাপতি। স্ত্রী প্রজাপতি সাধারণত পাতার ওপরে ডিম পাড়ে, তবে এই পাতা ঠিক করার ব্যাপারে অনেক শর্ত রয়েছে। ডিম থেকে শুঁয়োপোকা অবস্থায় পরিণত হওয়ার পরে ওই অবস্থায় এদের খাদ্যের ওপর ভিত্তি করেই মা প্রজাপতি পাতা বাছাই করে। এবং ডিমগুলো আঠা জাতীয় পদার্থ দিয়ে যুক্ত থাকে, যার ফলে ওগুলো নীচে পড়ে যায় না। ডিম থেকে শুঁয়োপোকায় পরিণত হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে। এদের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি, যার জন্য এদের অনেক খাবারের প্রয়োজন হয়। এরা অনবরত খেতে থাকে বলে এদের বৃদ্ধি অনেক তাড়াতাড়িও হয়। শুঁয়োপোকা থেকে গুটিপোকায় পরিণত হতে কমপক্ষে পাঁচদিন সময় লাগে। এসময় এরা একটা ককুনের মধ্যে থাকে, যাকে বলা হয় পিউপা। আর পিউপা থেকে পরিণত প্রজাপতি বের হতে পায় দু'সপ্তাহ সময় লাগে।

প্রজাপতির রঙের ব্যবহার

আমাদের বাসযোগ্য এই সুন্দর পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সবকিছুর পেছনেই কোনও না কোনও কারণ রয়েছে। ঠিক তেমনই প্রজাপতির এমন রঙিন পাখা থাকার পিছনেও একাধিক কারণ থাকে। বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করা, বিপরীত লিঙ্গের সদস্যকে চিনতে পারা এবং শিকারি প্রাণীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যও প্রজাপতি নিজের রঙিন পাখার ব্যবহার করে থাকে।

প্রজাপতির নিষ্ক্রিয় অবস্থা

আমরা সাধারণত প্রজাপতির নিষ্ক্রিয় অবস্থার সঙ্গে পরিচিত নই, কারণ সবসময়েই আমরা এই প্রাণীটিকে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উড়ে বেড়াতে দেখি। কিন্তু প্রজাপতির পিছনে একটু সময় দিলেই দেখতে পারবেন, যে এরা দিনেরবেলায় ছায়া পছন্দ করে না, রোদে ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহ করতে থাকে। আপনি যদি এদের গায়ের ওপরে কোনও কিছুর প্রতিবিম্ব ফেলে ছায়ার সৃষ্টি করেন তাহলেও এরা তখুনি সেখান থেকে উড়ে যাবে। কিন্তু দিনের শেষভাগে ঘটে সম্পূর্ণ উলটো ঘটনা। তখন এরা গাছ কিংবা অন্য কোনওকিছুর ওপরে বসে থাকে এবং শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। বিকালের শেষভাগ থেকে পরের দিন ভোর হওয়া পর্যন্ত এরা এভাবেই থাকে, যার কারণে এসময় এদের দেখা যায় না। আবার অনেক প্রজাপতিতে ডায়াপজ নামক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সাধারণত উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে গুটিপোকাগুলো এইরকম অবস্থায় মাসের পর মাস থাকে। বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যের দেখা মেলে।

প্রজাপতির বাসস্থান

বাসা বলতে যা বোঝায়, প্রজাপতির সেরকম কিছুই থাকে না। এরা সাধারণত দিনের শেষভাগ হতে পরেরদিন সকাল পর্যন্ত ইটের খাঁজে, কোনও বিল্ডিংয়ের মাঝে, গাছের ডালে কিংবা ঝোপঝাড়ে বসে থাকে। বিভিন্ন সরু স্থানে থাকার কারণে এদেরকে ওই সময়টায় দেখা যায় না।

প্রজাপতির খাবার

সবাই চোখ বুজে বলে দিতে পারবেন যে, সব প্রজাপতিই ফুলের মধু কিংবা গাছের রস খেয়ে থাকে। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, পতঙ্গ শিকারি প্রজাপতিরও দেখা মেলে। Miletinae নামক উপ-পরিবারের সদস্যেরা যাদেরকে সাধারণত Hervesters কিংবা WoollyLegs নামে ডাকা হয়, এরা Homoptera উপপর্বের পতঙ্গদের শিকার করে পিঁপড়েদের সঙ্গে মিথোজীবী সম্পর্কের সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, প্রজাপতি কোনও কিছু স্পর্শ করেই স্বাদ অনুভব করতে পারে। এদের পায়ের কিনারে একধরনের কেমোরিসেপ্টর থাকে, যার জন্য এরকম সম্ভব হয়।

প্রজাপতি ও মথের পার্থক্য

প্রজাপতি ও মথ উভয়েই লেপিডপ্টেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে এদের মধ্যে যেমন অনেক মিল রয়েছে, ঠিক তেমনই পার্থক্যও রয়েছে অনেক। মজার ব্যাপার হল, এই বর্গের অধীনে বেশিরভাগ প্রজাতিই হচ্ছে মথ এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রজাপতির তুলনায় মথের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় আটগুণ। প্রজাপতি দিনেরবেলায় সক্রিয় থাকলেও, মথ সাধারণত রাতেরবেলায় সক্রিয় থাকে। মথের তুলনায় প্রজাপতি অনেক বেশি রঙিন হয় যদিও, অনেক রঙিন প্রজাতির মথেরও দেখা মেলে। মথের অ্যান্টেনার সামনের অংশ তুলনামূলক বেশি মোটা হয়। মথ সাধারণত দিনেরবেলায় পাতার নীচের অংশে থাকে, যার কারণে এদের দেখা মেলা ভার।